একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজী হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোত্থেকে।

মুখ ভার ক'রে চলে আসছিল মোতালেফ। আশ্‌শেওড়া আর চোখ-উদানের আগাছার জঙলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হল ফুলবানুর সঙ্গে। কলসী কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিক ক'রে একটু হাসল ফুলবানু, 'কি মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি ?'

'চলব না ? শোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বা-জানের !'

ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাইছে তো দোষ হইছে কি ? পছন্দসই জিনিস নেবা, বা-জানের জুনা, তার দাম দেবা না ?'

মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বা-জানের নয়, বা-জানের মাইয়ার। হাটে বাজারে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'

মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান্, পাল্লায় উইঠা বসব। মুঠ ভইরা ভইরা সোণা জহরৎ ওজন কইরা দেবা পাল্লায়। বোঝব ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হন হন ক'রে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি ? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব' ?

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষেরে। মাইনষের তাজ দেখতে চায়, বুঝ্‌ছ ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মত জমি ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ, বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার ?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে মোতালেফ। গেল মল্লিক-বাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি, সিকদারবাড়ি, মুন্সীবাড়ি—কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ করে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশি হোল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনং কম নয়, এক একটি ক'রে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে তুলে জুৎসই ক'রে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই ক'রে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপ টুপ করে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক মেহনং। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এতো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হোল।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়াশুদ্ধ কেটে নিলেই হোল। এর নাম খেজুরগাছ কাটা। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুঁড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজে হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এ-সব তত্ত্বকথা আর বিধি-নিষেধও তার মুখের। রাজেকের মত অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে-কাছে ছিলনা। যে গাছের প্রায় বারো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজেকের হাতের ছোঁওয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়তো আধ-হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠতো। তার হাতে খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থরা। গাছের কোন ক্ষতি হোত না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। সাকরেদ দু'চারজন আরো ছিল রাজেকের—সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মত হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মত।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবেনা বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মত মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে,—কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড় করে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালিগুড়ে

পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পয়সায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমৎ মেহনৎ। কিন্তু বছর দুই ধরে বাড়ীতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু'বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজুখাতুনের ঝাঁপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজুবিবি ?

ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা ?' 'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি ? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাপটা একবার খুইলা দিতা, কয়ডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজুখাতুন উঠে ঝাপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কি কবা তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজুখাতুনরে। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মেঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই এ বছর।'

মোতালেফ মিষ্টি করে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজুখাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে ?'

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজুখাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ তামাসা থুইয়া দাও মেঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'

মোতালেফ বলল, 'শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজুবিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটান যায় ?'

ইসারা ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট ক'রে খুলে বলল মনের কথা। কোনরকম অন্যায় সুবিধা সুযোগ নিতে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা ক'রে নিয়ে যেতে চায় মাজুখাতুনকে। ঘর গেরস্থালির ষোল আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজুখাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ তামাসার আর মানুষ পাইলা না তুমি! ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে।'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজুবিবি। কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওন যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজুখাতুন, বলল 'সাঁচাই নাকি! আর আমি?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে, তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?'

তখনকার মত মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলি মাজুখাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পরিচয় অল্পদিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়ীতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দুজনের। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হাল্কা ঠাট্টা তামাসা চলত, কিন্তু তার বেশী এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজুখাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাট্টখোট্টা ধরণেরই ছিল রাজেকের। ভারি কড়া-কড়া চাঁছা-ছোলা ছিল তার কথাবার্তা। শীতের সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের

হাঁড়ি আনত মাজুখাতুনের উঠানে আর মাজুখাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালিগুড়। হাতের গুণ ছিল মাজুখাতুনের। তার তৈরী গুড়ের সের দু'পয়সা বেশি দরে বিক্রী হত বাজারে। রাজেক ঘরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশির ভাগ খেজুর গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু'এক হাঁড়ি রস কোনবার ভদ্রতা ক'রে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকার মত হাঁড়িতে আর ভরে যায়না তার উঠান। গতবার মাস খানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দু' আনা ক'রে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের মাজুখাতুন গুড় চুরি ক'রে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রী করাচ্ছে সেই গুড়, ষোল আনা জিনিষ পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজু-খাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধ-বুড়োদের দলের আরো করেছে দু'একজন কিন্তু মাজুখাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের ইয়াকি দিতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজুখাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ান যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খাপসুরৎ মুখও কারোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরো আসতে হোল দু'এক সন্ধ্যা, তারপর নীল রঙের জোনাকী শাড়ি প'রে, রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজুখাতুন।

ঘরদোরের কোন শ্রী ছাঁদ নেই, ভারি অপরিষ্কার আর আগোছালো হয়ে রয়েছে সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাজুখাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার

কাটে। ঝাঁট দিয়ে দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠানের, লেপেপুঁছে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরণীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের, সে আছে গাছেগাছে। পাড়ায় আরো অনেকের—বোসেদের, বাঁড়ুয্যেদের গাঁছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ ক'রে দিচ্ছে রস। পাকাটির একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজুবাহুকে মোতালেফ উঠানের পশ্চিমদিকে। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় মাটির জালা বসিয়ে সেই চালাঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জ্বাল দেয় মাজুবাহু। জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয়। মাজুবাহু এর ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেকদিন পরে মনের মত কাজ পেয়েছে মাজুবাহু, মনের মত মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি করে আসে চড়া দামে। বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লা বাঁশের এক্কেকটি করে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারাদিনের ময়লা রস চোঙাগুলির মধ্যে জমে থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায়না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ' আনা সের। দু'বেলা দু'বার ক'রে এতগুলি গাছে উঠতে নামতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে। পায়ের নিচে দুর্বার মধ্যে চিক চিক করে

রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়াপড়শীরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ কিন্তু বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিনরাত এমন কলের মত পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায় নি কোনদিন। ব্যাপারটা কি? গাছ কাটা অবশ্য মনের মত কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু' হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালি গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হোল চরকান্দায় এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলে রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, ব'লল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা করকরে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোণায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায় নি কোথাও, কোন জায়গায় ছাপ লাগে নি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব মেঞা? তুমি তো শোনলাম নেকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান্ আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে দিন রাইত।'

মোতালেফ মুচকে হাসল। বলল, 'তার জৈন্তে ভাবেন ক্যান্ মেঞাসাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ ক'রে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিষ আছে মেঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবাহুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবাহুর কিছু বাকী ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবাহু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে।'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কি!'

মানের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কি ক'রে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি ক'রে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি ক'রে।

ফুলবাহু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা কিন্তু গায়ে যে আর একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়াবা কেমনে।'

মনে এলেও মুখফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে, মানুষ চ'লে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আর একজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তা'হলে সে গন্ধ তো ফুলবাহুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতর গুনা ঘইসা ঘইসা বদ্ গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবাহু বলল, 'সাঁচাই নাকি?' মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না ত কি মিছা'? শুইঙা দেইখো তখন নতুন মাইনষের নতুন গন্ধে ভুঁর ভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুর ভুর করবে, কেবল সবুর কইরা থাক আর দুইখান মাস।'

ফুলবাহু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু'মাসের বেশি সবুর করতে হোল না

ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভারি আপত্তিকর।

মাজুখাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ, ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর্ দূর্!'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের; ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। পাড়াপড়শী বলল, 'এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধরে ফুলবানুর, 'থুইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন ঘর-গেরস্থালি। কাছে বস আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর সবুর! এ কয়মাস কাটাইলা কি কইরা মেঞা?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া।'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু 'গাছি'র কাছেও যে গাছের রস তুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।'

৫

মাজুখাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো পড়ো শণের

জুড়ে। ভেবেছিল আগের মতই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। পাড়াপড়শীরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফুলবাহুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের সুরে বলে, 'না:, বউ বউ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সী ছুঁড়ী-টুড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না কিছু। তাই মাজুখাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, এক-পঞ্চাশ।'

মাজুখাতুন খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ ওই রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তারপর মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান্! ওসব কাম কোন কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান্ বউ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজুখাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহ'লে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি দেরি করতে চায় না।'

মাজুখাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কি।'

দেরি বেশি হোলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজুখাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মত ফাঁৎ ফাঁৎ নিশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত, তার হাতগুনা তো বাচলাম, কি কও ফুলজান?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'

'ক্যান্, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'

'ডর নাই? পাখা মেইল্যা কখন্ উরাল দেয় তার ঠিক কি!'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উরাল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই সব পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইনষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'চৌখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারি আদরে সোহাগে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালোবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার ক'রে কেনে সেই মাছ। ভিমটা,

আনাজটা, তরকারিটা যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মসলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান্, তুমিতো বেশি ভক্ত না পানের। দিন রাইত খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্তে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে, পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজ্জা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর-একজনের পানখাওয়া-ঠোঁটের রস লাগে।'

•

নিজের ভুঁই ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভালো কৃষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মত নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারি খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিষেচারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে। কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা।'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ-দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলি পাওয়া যাবে তাহ'লে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউস ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ—এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারি কাতর মোতালেফ। একেক দিন পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পার না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলাবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়ীতে।'

যেখানে যেখানে জোঁকে মুখ দিয়েছিল সে সব জায়গায় সযত্নে চুণ লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কৃষাণের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের একভাগ। ধামায় ক'রে পৈকায় ক'রে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় ক'রে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেকবার বলে ভারি কষ্ট হয় বউ, না?'

ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না! কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্থ ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি!'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে

যেখুরে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ে। এ কাজে নাম ডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই সেরা। এবারেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ বেড়ে গেল।

গাছ কাটবার ধুম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবাহুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধার দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মত দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমে ভেঙ্গে আসে চোখ। দু'হাতে ঠেলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবাহু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোন অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবাহু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো ডালপাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ। ফুলবাহুকে বলে, 'রস জ্বাল দেও,—যেমন মিঠা হাত, তেমুন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিষ হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবাহুর, বুক কাঁপে। দু'এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়ীতে, কিন্তু এত রস এক সঙ্গে সে কোনদিন দেখেনি, কোনকালে জ্বাল দেয়নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কি, আমি তো আছিই কাছে কাছে—আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জ্বালার মধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস শুকিয়ে আসে ফুলবাহুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন ক'রে টগবগ করে না জ্বালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখ-মুখ শুকিয়ে আসে ফুলবাহুর, রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমত।

কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইয়া কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝ না। এই গুড় হইছে, এই নি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে 'কেনবে না ক্যান্। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুসি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা। খাপসুরৎ মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু'চারদিনের মধ্যেই কোনরকমে চলনসই গুড় তৈরী করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না। কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মত, খদ্দেররা তেমন খুসি হয় না দেখে।

পুরোন খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মেঞা? গত হাটে নিয়া দেখলাম গেল বছরের মত সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জিহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতলেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মত এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুসি হচ্ছে না, খেয়ে খুশি হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্তে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বার কয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা তুইল্যা ফোঁটা দেইখ্যো নামাবার সময় হইল কিনা ঢালবার সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে 'হু হু, চিনছি। আর বক বক কইর্যো না, ঘুমাইতে দেও মাইনুষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজুখাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজু-খাতুন এমন করে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায় ক'রে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাকাটির চালার দোরের কাছে: 'কি রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোন জবাব এল না ফুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কি রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড়? সারে সারে গোটা পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণ-কোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কি ক'রে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভিতর থেকে। বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া করে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চীৎকার বেরুল,—'কই, কোথায় গেলি হারামজাদী?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দু'দিন ধ'রে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড় চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা সাবান

মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুঠি ক'রে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এই জৈন্যই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে!'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তোমার?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটা কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো আর মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারি বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমন প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম করল না।

ফুলবানু বলল 'আমারে লইয়া যাও বা'জান তোমার সাথে—এমন গোঁয়ার মাইনষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদল-বদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই, আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে।

স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি। দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলও। খানিক বাদেই আবার যেচে আপোষ করল মোতালেফ। সেধেভজে মান ভাঙাল ফুলবানুর। পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোন রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।'

ফুলবানু বলল 'কষ্ট আবার কি।'

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরণ আলাদা, ধ্বনি আলাদা; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। বলে ও জানে, শোনে ও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ী এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ ক'রে ব'সে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মত যেন সুখ নেই মনে, ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাদির শেখের সঙ্গে।

'সেলাম মেঞাসাব'।

'আলেকম আসলাম্।'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো, সব ছাওয়ালপান ভালো তো—?'

মাজুখাতুনের কথাটা মুখে এনেও আনতে পারলে না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোন রকম সকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই তিন গুড় লইয়া যান না মেঞা। ভালো গুড়।'

নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনকালে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস ক'রে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমনতরো ব্যাপারী! গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জৈন্যে কি? দুই সের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানরে খাইতে। কয়ন জানি, চাচায় দিছে।'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যায়ুন আইজ। খাইয়া গ্যাখেন। দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটাবার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুনপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলি কত মিথ্যা, পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারতপক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা-কওয়ায় একসের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজী হয় নাদির, আর বাকি দু' সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর ক'রে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজুখাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও গুড় ছোব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজুখাতুন নিষেধ ক'রে দিয়েছে নাদিরকে, 'খবরদার, ওই মাইন্‌ষের সাথে যদি ফের খাতির নাতির কর, আমি চইলা যাব ঘরগুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজুখাতুনকে ভারি ভয় করে নাদির। কাজে-কর্মে সরেশ, কথায়-বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দু'টি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু' হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়া নৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপ্‌টানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে; 'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা?'

হুঁকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে; 'কেডা? ও, আপনে? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান্ মেঞাসাব?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির কিন্তু মনে মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজুখাতুনের জন্য। যে মানুষের নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজুখাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই

নাইমা যাইতে কও। একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে? কোন মুখে উঠল আইসা এখানে?'

নাদির ফিস ফিস ক'রে বলে, 'আস্তে, আস্তে,—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শোনতে পাবে। মাইন্‌ষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইন্‌ষে।'

মাজুখাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ কর, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে, একটুও ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি লাজসরম নাই?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজুখাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে; মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়ি দু'টি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাব, শোনবেন নি একটু?'

নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসেন মেঞা, বসেন। ধরেন, তামাক খান।'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই ক'ন না, দোষ কি তাতে?'

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নাই। ক'ন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জৈন্যে আনে নাই রস, সেইটুক বুদ্ধি তাঁর আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজুখাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'ভয় কিসের জৈন্যে আনছে?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া ছইসের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মিঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর একছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার।'

গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর-দুটি চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠেছে। চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হল না।

হঠাৎ যেন হুঁস হোল নাদির শেখের, বলল, 'ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুননি নিবা গেল কইলকার?'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞাভাই, নেবে নাই।'

অবতরনিকা

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সরোজিনী একটু কান খাড়া করে রইলেন।

তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'এই বোধ হয় এলেন আমাদের মহারাণী। রাত আটটার সময় ঘরের লক্ষ্মীর ঘর-সংসারের কথা মনে পড়ল। দুদিন ধরে মেয়েটার যে জ্বর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই! যাই খুলে দিয়ে আসি।'

সরোজিনী উঠে দাঁড়ালেন।

সুব্রত তক্তপোষে বসে এতক্ষণ স্ত্রীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগগুলি শুনছিল, সরোজিনীকে বাধা দিয়ে বলল : 'তুমি থাক মা, আমিই যাচ্ছি।'

হাত দেড়েক দূরে পুবদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রুগ্না নাত্নির কাছে বসে প্রিয়গোপাল দুহাতের তেলোয় ঠেকিয়ে অভ্যস্তভাবে হাঁটু নাড়ছিলেন, মন্তব্য করলেন : 'এত রাত্রি অবধি কোন্ গৃহস্থের বউ বাইরে থাকে! এমন যে হবে, আমি আগেই জানি। আস্তাবলের ঘোড়া আর ঘরের বউ-ঝি'র রাশ যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায়—'

সরোজিনী বাধা দিয়ে বললেন : 'থাক্ থাক্। তোমাদের কার যে কতখানি মুরোদ, তা দেখা গেছে।'

তারপর ছেলের দিকে তাকালেন সরোজিনী : 'যাচ্ছ, যাও। কিন্তু খবরদার, ভোম্বল, বোউয়ের সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করতে যেয়ো না, অশান্তি বাধিয়ে দরকার নেই। ধীরে সুস্থে যা বলবার পরে বলো।'

সুব্রত কোন কথা না বলে সদরের দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে দিতেই আরতি ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল : 'কতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি!

আচ্ছা বাতিক হয়েছে মনোমোহনবাবুর ; সন্ধ্যা হতে না হতেই সব সদর বন্ধ করবেন, তারপর দোর ভেঙে ফেললেও কেউ খুলতে আসবে না।'

সুব্রত স্ত্রীর দিকে তাকাল।

সদর দরজায় আলোর ব্যবস্থা নেই। দোর খুললেই গলির মোড়ের গ্যাসের আলোয় খানিকটা এসে পড়ে, সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল, আরতির চেহারা—দীর্ঘ দোহারা গড়ন। এই ক'মাসের মধ্যে যেন আরো ইঞ্চিখানেক বেড়েছে আরতি। কিংবা হাই হীল পরেছে বলেই ওই রকম মনে হয়। বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ডান হাতে একটা গ্লুকোজের টিন, আরো কি একটা ঠোঙা। মাথায় আঁচল নেই।

সুব্রত বলল: 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে দু ঘণ্টা আগে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

স্বামীর প্রশ্নের ভঙ্গিতে আরতি একটু হাসল, বলল : 'বেড়াচ্ছিলাম লেকের ধারে।'

সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিল সুব্রত।

আরতি বলল : 'ওকি, চললে নাকি! দাঁড়াও, হাতের জিনিসগুলো ধরো দেখি একটু।'

সুব্রত বলল : 'কেন ?'

আরতি বলল : 'আহা ধরই না, মান যাবে না তাতে, মাথার কাপড়টা একটু ঠিক ক'রে নেই, বাবা মা রয়েছেন।'

সুব্রত বলল : 'সারা রাস্তাটাই যখন বেঠিক হয়ে আসতে পারলে, ঘরে ওটুকু লজ্জা না দেখালেও চলবে।'

হন্ হন্ করে সুব্রত চলে গেল ভিতরে।

একটু বাদেই আরতি এসে ঘরে ঢুকল। দেখা গেল সুব্রতের সাহায্য ছাড়াই সে মাথায় আঁচল টানবার ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

'কেমন আছেন মন্দিরা ?'

হাতের জিনিসগুলি তাকের ওপর নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল আরতি।

প্রথমে কেউ কোন কথা বলল না। একটু বাদে সুব্রত বলল : 'সে খোঁজে তোমার কি কোন দরকার আছে ?'

আরতি এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে এসে ঘুমন্ত মেয়ের কপালে একটু হাত রেখে বলল : 'জ্বর এখন অনেক কম।'

পাশের ঘরে সুব্রতের ছোট ভাইবোনেরা পড়া মুখস্থ করছিল, আরতির সাড়া পেয়ে ছুটে এল নীলা, নন্তু আর সন্তু।

সন্তুর আগ্রহ সবচেয়ে বেশী : 'কমলা লেবু এনেছ বউদি ?'

আরতি তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল : 'এনেছি।'

প্রিয়গোপাল ধমক দিয়ে উঠলেন : 'যাও পড় গিয়ে। রোজ কমলালেবু তোমাদের না হলেই চলবে না, না ?'

আরতি শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বলল : 'লেবুগুলো আজ একটু সস্তাতেই পেয়ে গেলাম বাবা। কাল যে লেবু আপনি আটটা ক'রে এনেছিলেন, আজ তার চেয়েও বড় লেবু দশটা এনেছি টাকায়। আপনাকে ঠকিয়ে দিয়েছিল।'

প্রিয়গোপাল বললেন : 'বুড়ো মানুষকে সবাই ঠকায় মা। কিন্তু জিনিষ-কিনতে হয়, দিনের বেলায় কিনবে। কেনা-কাটার জন্য এত রাত করা কি ভালো ?'

আরতি এবার গম্ভীরভাবে জবাব দিল : 'কেনা-কাটার জন্য রাত হয়নি বাবা। অফিসের কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ট্রামের গোলমালেও দেরি হ'ল খানিকটা।'

সরোজিনী এতক্ষণ বাদে কথা বললেন : মেয়েকে কি আর রাখা যায় ? সারা বিকেল ভ'রে মা আর মা।'

আরতি একথার কোন জবাব না দিয়ে আটপৌরে একখানা শাড়ী তুলে নিল আলনা থেকে। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সুব্রত এল পিছনে পিছনে : 'দাঁড়াও, কথা শোন।'

আরতি তাড়াতাড়ি দরজার পাল্লাটা ঠেলে দিয়ে বলল : 'কাপড়টা ছাড়তে দাও আগে।'

সুব্রত রূঢ়কণ্ঠে বলল: 'পরে ছেড়ো, আগে জবাব দাও আমার কথার। আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন অফিসে গেলে, আজ?'

আরতি ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল: 'না গেলে চলবে কি করে? মেয়ের অসুখের জন্যে বলছ তো? মন্দিরার সামান্য জ্বর, কি পেটের অসুখের জন্য তুমি কামাই করতে পার অফিস? তা ছাড়া একা তো ফেলে যাইনি তোমার মেয়েকে। বাড়ীতে আদর-যত্নের মানুষ আরো না ছিল, তা তো নয়।'

সুব্রত একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: 'অফিস তোমাকে আমি কামাই করতে বলিনি। যে অফিসের কাজে রাত আটটা অবধি তোমাকে বাইরে থাকতে হয়, বাড়ির কারো সুবিধা-অসুবিধা অসুখ-বিসুখ পর্যন্ত দেখা চলে না, তেমন অফিস তোমাকে কিছুতেই করতে দেব না আমি।'

আরতি বলল: 'দেরি তো আর রোজই হয় না। তা ছাড়া চাকরি না করলে চলবেই বা কেমন ক'রে?'

সুব্রত বলল: 'কি ক'রে চলবে, তা আমি বুঝব। এতদিন যে চাকরি করনি, তাতে অচল ছিল সংসার? তা ছাড়া আমার যখন ভালো একটা পার্ট-টাইম জুটে গেছে, কি দরকার তোমার অত কষ্ট ক'রে?'

শেষ কথাটা বেশ নরম সহানুভূতির সুরে বলল সুব্রত।

শোয়ার সময় প্রসঙ্গটা ফের একবার উঠল। খাওয়া-দাওয়া সেরে পান-মুখে ঘরে যখন শুতে এল আরতি, হাতের বইটা বন্ধ ক'রে এক আধটু একথা-ওকথার পর সুব্রত স্ত্রীকে বলল: 'কালই একটা রেজিগ্‌নেশন লেটার ছেড়ে দিয়ো।'

আরতি এবার অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল: 'আমার চাকরি ছাড়া নিয়ে তোমার অত মাথা ব্যথা হয়েছে কেন বল তো?'

স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল—সুব্রত; তারপর শান্তভাবে বলল: 'আজকাল কথাবার্তার চমৎকার ধরণ হয়েছে তোমার!'

আরতি লজ্জিত ভঙ্গিতে চুপ ক'রে থেকে একটু হাসল: 'সত্যি মেজাজ

ঠিক থাকে না সব সময়। আজ কি রকম ঘোরাঘুরিটা গেছে, তাতো জানে না। সেই টালিগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। দেরী তো সেই জন্যই হ'ল। দেরি হলেও কাজ হয়েছে, ইন্দিরারা নেবে একটা মেশিন, বার টাকা রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

'আরতি ভেবেছিল, কথাটায় সুব্রত আগের মত একটু উল্লাস বো করবে। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সুব্রত তেমনি নীর আর গম্ভীরভাবে বলল: 'রাত আটটা অবধি যেখানে সেখানে তোমা ঘুরাঘুরি করেও দরকার নেই, রোজগারেরও দরকার নেই।'

আরতি বলল: 'টাকা এলে তো ফেলা যায় না! সংসারের কাজে লাগে।'

সুব্রত জবাব দিল: 'কিন্তু টাকার চাইতেও বড় প্রেস্টিজ, বড় পারিবারিক শান্তি। তা ছাড়া আমি চাইনে আমার স্ত্রী শুধু একটা টাকা-আনা-পাইয়ের একটা থলি হয়ে থাক।'

আরতি একটু হাসল: 'তুমি আজকাল ঠিক যেন অনেকটা বাবার মত কথা বলছ।'

বাবা মানে সুব্রতর বাবা।

সুব্রত স্ত্রীর মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল: 'হ্যাঁ, বলছি। বলবার দরকার হয়েছে বলেই বলছি। সংসারের প্রয়োজনে তোমাকে আমিই চাকরি নিতে বলেছিলাম, আবার দরকার বুঝে আমিই তোমাকে ছাড়তে বলছি। চাকরি তোমাকে ছাড়তে হবে।'

'বেশ।' ব'লে আরতি পাশ ফিরল এবং তারপর আর কথা বলল না।

এ মৌনতা যে সম্মতির লক্ষণ নয়, তা বুঝতে দেরি হ'ল না সুব্রতের। আশ্চর্য, দিনের পর দিন আরতির জেদ বেড়ে যাচ্ছে! অর্থের লোভ যাচ্ছে সীমা ছাড়িয়ে। একে তো সুব্রত কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারে না। দিনরাত আরতির এই অর্থোপার্জনের চেষ্টাকে ভারি স্থূল মনে হয় সুব্রতের, মনে হয় আরতির সমস্ত সুকুমার বৃত্তি দিনের পর দিন টাকার নীচে তলিয়ে যাচ্ছে।

মাস ছয়েক আগে খবরটা অবশ্য প্রথমে সুব্রতই দেখিয়েছিল। অফিস থেকে যা মাইনে পায়, তা মাসের পনের দিন যেতে না যেতেই নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়। টিউশনির টাকাটা নিয়মিত আদায় হয় না। ফলে পরের দুই সপ্তাহের রেশন আর বাজারের টাকাটা সংগ্রহ করতে প্রতি মাসে প্রাণান্ত হয় সুব্রতের। সংসারে রোজগেরে সে একা হলেও পোষ্য অনেক। নিজেরা স্বামী-স্ত্রী, আর দুটি ছেলে-মেয়ে। তা ছাড়া আছেন বুড়ো বাপ, মা, আর ছোট ছোট তিনটি ভাইবোন। ভাই দুটিকে স্কুলে দিতে হয়েছে। উল্টোডাঙ্গার সরু গলির মধ্যে একতলায় ছোট ছোট দুখানা ঘর। তারই ভাড়া গুণতে হয় মাসে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা। সাংসারিক খরচ ছাড়াও অসুখ-বিসুখের খরচ আছে। লোক-লৌকিকতাও কিছু না রেখলে চলে না। ফলে প্রতি মাসে জমার চেয়ে খরচের অঙ্ক ভারী হয়ে ওঠে।

টাকা ধারের চেষ্টায় বেরিয়ে একদিন বন্ধুর বাড়ি থেকে শুধু হাতে ফিরে এল সুব্রত। আরতি স্বামীর মুখ দেখেই সব বুঝতে পেরেছিল।

'দেখা হোল না বুঝি ?'

সুব্রত বিরস মুখে বলল : 'দেখা আর হবে না কেন ? পরিমল দুঃখ জানিয়ে বলল, তার হাতও এখন ভারি ঠেকা। বলল, দুজনে মিলে চাকরি করছে, তবু সংসারের খরচের সঙ্গে পেরে উঠছে না।'

কথাটা কানে বাধল আরতির, বলল : 'দুজনে মিলে মানে ?'

সুব্রত বলল : 'দুজনে মিলে মানে মাধুরীও চাকরি করে আজকাল। মাস্টারি করে কি একটা গার্লস্ স্কুলে। সবাই তো আর আমাদের মত নয়।'

আরতি চুপ করে রইল। খোঁচাটা হজম করল মনে মনে। পরিমল-বাবুর স্ত্রী মাধুরীও তাহ'লে চাকরি নিয়েছে! এর আগে আরো কয়েকজন বন্ধু-পত্নীর চাকরির খবর দিয়েছে সুব্রত। কারো মাস্টারি, কারো কেরাণীগিরি।

একটু বাদে সুব্রত ফের বলল: 'পুরুষ হোক, মেয়ে হোক, আজকাল বসে

খাওয়ার কি জো আছে কারো? চেষ্টাচরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হোত না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হোত আমার।'

আরতি একটু বিস্মিত হয়ে বলল: 'আমি? আমাকে চাকরি দেবে কে? তা'ছাড়া তোমরাই কি আর করতে দেবে?'

সুব্রত বলল: 'করতে নামলে কেউ কি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে?'

এতদিন আরতি সংসারের খরচ কমাবার চেষ্টা করে এসেছে। জমা-খরচের খাতা খুলে খুঁটে খুঁটে দেখেছে, ব্যয়ের অঙ্কটার কোথায় ছাঁটাই চলে। স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সপ্তাহে তিনদিন নিরামিষ-ভোজনের ব্যবস্থা করেছে, জামা কাপড়ের বেশির ভাগ নিজেরা কেচে নিয়ে কমিয়েছে ধোপার খরচ, কয়লার ব্যয় হ্রাস করবার জন্য সকালে বিকালে গুল দিতে বসেছে নিজের হাতে। প্রতি মাসেই ভেবেছে, সংসারের খরচটা অনেক কম হবে এমাসে। কিন্তু ঠিক সেই মাসেই হয়ত ছিঁড়ে গেছে শ্বশুরের পাঞ্জাবী, কাচতে ফেঁসে গেছে শাশুড়ীর শাড়ি, না হয় মেয়েটা পড়েছে কঠিন অসুখে, কিংবা পাড়ার সিনেমা-হাউসে এসেছে খুব ভালো একখানা বই। লুকিয়ে লুকিয়ে একা তো আর দেখবার জো নেই, সাধ-আহ্লাদ সকলেরই আছে।

এবার তার খেয়াল হ'ল, কেবল খরচ কমানো নয়, আয় বাড়াবার দিকেও সে চেষ্টা করতে পারে। একেবারে মূর্খ তো সে নয়। ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল বিয়ের আগে। কলেজেও পড়েছিল বছর খানেক। তারপর বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুর-বাড়ি গাঁয়ে, সেখানে স্কুল-কলেজ নেই। বাবা বলেছিলেন: 'বেশ তো, যদি পড়তেই চাস, একটা বছর আমার বাসায় থেকে পড়ে পরীক্ষা দে। ভয় নেই খরচ নেব না তোর শ্বশুরের কাছ থেকে।'

কিন্তু প্রিয়গোপাল রাজী হননি। আরতির বাবাকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন: 'বেয়াই মেয়েকে যা শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন, আগে তাই হজম করতে পারি কি না দেখি, তারপর না হয় স্কুল কলেজে পাঠাব।'

পুত্রবধূকে পুজোর ঘর থেকে গোয়ালঘর পর্যন্ত সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে

বলেছিলেন : 'সব ভার এবার থেকে তোমার মা। স্কুল বল, কলেজ বল সংসারের চেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর নেই। এখানে হাতে-কলমে যা শিখবে, দশটা ইউনিভার্সিটির সাধ্য নেই তা শেখায়।'

তারপর বছর দুয়েকের মধ্যেই জমিদারী সেরেস্তার চাকরি গেল প্রিয়গোপালের। খরচা বেশী পড়ায় গরুটা বিক্রি করে দিতে হ'ল। পুজোর মণ্ডপে ধূপ-দীপ থেকে নৈবেদ্যের থালা সবই সংক্ষিপ্ত হয়ে এল। আরো পরে এল পাকিস্তানের হাঙ্গামা। পাঁচজন ভদ্র প্রতিবেশীর দেখাদেখি প্রথমত বাড়ির বয়স্থা বউ-ঝিদের কলকাতায় পাঠালেন প্রিয়গোপাল। কিন্তু সুব্রত লিখল : 'দু'জায়গায় খরচ চালাবার আমার সাধ্য নেই। মাকে নিয়ে আপনিও চলে আসুন।'

স্থাবর অস্থাবর খানিকটা ছাড়িয়ে, খানিকটা জ্ঞাতি ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে রেখে শেষ পর্যন্ত প্রিয়গোপালও চলে এলেন ছেলের বাসায়। ভেবেছিলেন, দু'এক মাস থেকেই চলে যাবেন। কিন্তু যাই যাই করে আর নড়তে পারলেন না। আজ নিজের অসুখ, কাল নাতির, তা ছাড়া সহস্র অভাব-অনটনের মধ্যেও কেমন এক ধরণের সুখও আছে শহরে থেকে। যৌবনের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাই এসে জড়ো হয়েছে শহরে। আনা চারেক পয়সা কোন রকমে পকেটে করতে পারলেই এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। দেখা-সাক্ষাৎ চলে পুরনো বন্ধু-বান্ধব, কুটুম্ব-স্বজনের সঙ্গে চায়ের দোকানে, রেশনের লাইনে নতুন আলাপও মন্দ লাগে না। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করেন প্রিয়গোপাল : 'শহর তো নয়, সপ্তরথীর চক্রব্যূহ। এখানে কেবল ঢুকবার পথ আছে বেরুবার রাস্তা নেই।'

আরতি বলে : 'বেরুবেন কেন বাবা? থাকুন আমাদের কাছে।'

তারপর আরতি দৈনিক কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপনে চোখ বুলায়, আর খামের ওপর পোষ্টবক্সের নম্বর উদ্ধৃত করে পাঠায় আবেদন পত্র।

সে আবেদন নিজেই রচনা ক'রে দেয় সুব্রত, অফিস থেকে নিজেই টাইপ করিয়ে আনে। আরতি শুধু সুন্দর হাতে নাম স্বাক্ষর করে। মাঝে মাঝে

বেশ লাগে। যেন নতুন রোমাঞ্চের সন্ধান পেয়েছে দুজনে। নতুন ধরণের যৌথ কৃষ্টি!

কিন্তু লক্ষ্য কেবল ভ্রষ্টই হয়, ভেদ আর হয় না। দু' একটা স্কুল থেকে 'ইন্টারভিউ' হয়ত আসে। তারপর দেখা সাক্ষাৎ করে আসবার পর শোনা যায়, তারা সেই পোষ্টে একজন গ্রাজুয়েটকে পেয়ে গেছে।

অবশেষে এল ক্যানিং ষ্ট্রীটের মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী ফার্ম থেকে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ। কিছুদিন আগে কয়েকজন ভদ্র ঘরের তরুণী ডিমনষ্ট্রেটর চেয়ে ছিলেন তাঁরা। মাইনে সুরুতে একশ, ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

সুব্রত একবার বলল: 'কিন্তু—'

আরতির মনেও যে খুঁৎখুঁতি একটু না ছিল, তা নয়। মাস্টারি কেরাণী-গিরির মত তেমন সম্ভ্রান্ত চাকরি নয়। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এ চাকরির কথা কি তেমন করে বলা যাবে?

'কিন্তু মাইনে তো একশ?' আরতির ফের মনে পড়ে গেল।

এদিকে সুব্রতের টিউশনির টাকাটা নিয়মিত আদায় হচ্ছে না। ছাত্রটি ফেল করেছে। এক মাসের টাকা হয়ত মারাই যাবে।

একটু চুপ করে থেকে সুব্রত বলল: 'আজকাল অবশ্য বাছাবাছির কোন মানে হয় না, কত জনে কত কি করছে!'

আরতি ম্লানভাবে একটু হাসল: 'আমি তো বাছতে চাইনে। কিন্তু যারা নেবে, তারা তো বেছেই নেবে? ওদের কি পছন্দ হবে আমাকে? ইন্টারভিউতে কি পারব?'

সুব্রত বলল: 'তা কি করে বলব? তবে আমি যদি বোর্ডে থাকতাম, হয়ত পছন্দই করতাম।'

আরতি হাসল: 'হুঁ, তাই না আরো কিছু। তুমি সব চেয়ে আগে অপছন্দ করতে। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে বাঙালীরা নিজের স্ত্রীর মুখই নাকি সবচেয়ে সুন্দর দেখত। এখন তাদের চোখ বদলেছে।'

অসুস্থ শাশুড়ীকে দেখবার নাম করে সুব্রতই অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে

সঙ্গে করে নিয়ে গেল ক্যানিং স্ট্রীটে। চারতলা বাড়ির দোতলা থেকে ঝুলছে মুখার্জী এণ্ড মুখার্জীর সাইন বোর্ড। করিডোরে একদল মেয়ের ভিড়।

সুব্রত নিচ থেকেই বলল: 'যাও ভিড়ে পড়' গিয়ে।'

আরতি বলল: 'তুমি যাবে না সঙ্গে?'

সুব্রত বলল: 'হ্যাঁ তোমার ইণ্টারভিউ হোক, আর আমি স্বামী হয়ে সাক্ষী গোপালের মত দাঁড়িয়ে থাকি! অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, ভয় কিসের? আরো কত মেয়ে এসেছে। ক'জন স্বামীকে নিয়ে এসেছে সঙ্গে?'

অবশ্য স্বামী অনেকের হয়নি। সুব্রত আড়চোখে অন্যান্য সাক্ষাৎ-প্রার্থিনীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। বেশির ভাগই কুমারী।

সুব্রত বলল: 'তা ছাড়া অফিসে জরুরী কাজ আমার। দেরি করলে চলবে না।'

তবু আরতি আর একটু কাছে ঘেঁষে এসে বলল: 'কি জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবে বল দেখি? ভয়-ভয় করছে, পারব কি পারব না।'

সুব্রত সাহস দিল স্ত্রীকে: 'না পারবার কি আছে? দোকানের কাজে এমন কিছু সবজান্তা মেয়ের তো আর দরকার নেই। চটপটে চালাক চতুর আছ কিনা, তাই হয়ত দেখে নেবে। তা ছাড়া, যে জিনিষটা ওরা চেয়েছে, সেই সেলাই টেলাই তো তোমার ভালোই জানা আছে, ভাবনা কি?'

যেতে যেতে আর একবার পিছন ফিরে তাকাল সুব্রত। আরতির মুখ দেখে মনে হল, বেশ একটু ঘাবড়ে গেছে। মায়াও হল খানিকটা। নিজের প্রথম দিককার ইণ্টারভিউগুলির কথা মনে পড়ল। তখন সুব্রতও কি ঘাবড়াত না? হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একটু। হাতে সময় থাকলে আর কাজের চাপ না থাকলে, আরতির কাছেই সে থেকে যেতে পারত।

অফিস থেকে ফিরে আসবার পর চায়ের সঙ্গে স্বামীকে সুখবর দিল আরতি—মেয়ে ছিল বাইশ জন, গ্রাজুয়েটও ছিল জন দুই, তাদের মধ্যে চার জনকে পছন্দ হয়েছে মুখার্জী এণ্ড মুখার্জীর, আরতি সেই চারজনের অন্যতম।

সুব্রত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল: 'কি করে বুঝলে যে তুমি মনোনীতাই হয়েছ, অমনোনীতাদের দলে পড়নি?'

আরতি একটু হাসল: 'তা কি আর বুঝতে বাকি থাকে? তা ছাড়া সিনিয়র মুখার্জী একরকম স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন আসবার সময়। আমার সাংসারে কে কে আছে, ছেলে পুলে রেখে আসতে পারব কিনা, অভিভাবকদের মত হবে কিনা—খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞেস করবার পর বলেই দিলেন, আমাকে তাঁদের পছন্দ হয়েছে। দু'তিন দিনের মধ্যেই এ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার আসবে।'

এলও তাই। ইংরাজীতে চিঠি এল আরতি মজুমদারের নামে। মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী তাকে অস্থায়িভাবে অফিস এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হিসাবে নিয়োগ করতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন। কাজের যোগ্যতা দেখে তিনমাস পরে স্থায়ী পদের অধিকার দেওয়া হবে।

সুব্রত জিজ্ঞেস করল: 'কাজটা কি?'

'কাজ এমন কিছু শক্ত নয়। ষ্টেশনারী ষ্টোর্স ছাড়াও বোম্বাই থেকে নূতন ধরণের এক উলেন মেশিনের এজেন্সী নিয়েছেন মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী। সে মেশিনে শীতের সোয়েটার আর জাম্পার তৈরী হবে। গরমের দিনেও তৈরী করা যাবে মেয়েদের নানা ধরণের অঙ্গাবরণ। প্রথমে যন্ত্রের ব্যবহার শিখে নিতে হবে কোম্পানীরই এক মেমসাহেবের কাছে, তারপর ব্যবহার শিখিয়ে দিয়ে আসতে হবে ক্রেতাদের মানে ক্রেত্রীদের ঘরে ঘরে গিয়ে। আড়াইশ টাকা দামের মেশিন। প্রধানত সখেরই জিনিস। অবস্থাপন্ন বড় লোকের ঘরে ছাড়া বড় একটা বিক্রী হবে না। মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী এমন মেয়ে চান, যে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর থেকে এলেও অভিজাত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে রুচিসম্মতভাবে আলাপ ব্যবহার করতে পারবে। যাদের চেহারা চোখকে পীড়িত করে না, আচার আচরণ, কথাবার্ত্তা মনকে প্রসন্ন করে, এমন মেয়েদের চেয়েছিলেন মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী।'

আরতি সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু এরপর আর প্রসঙ্গটা বাপ-মার কাছে গোপন রাখলে চলে না।

সুব্রত স্ত্রীকে বলল: 'তুমিই বল বাবাকে। তোমাকে স্নেহ করেন।'

আরতি বলল: 'আর তোমাকে বুঝি করেন না? আমি কিছুতেই ওঁদের কাছে বলতে পারব না।'

সুতরাং সুব্রতই বলল।

প্রিয়গোপালের গড়গড়া থেমে গেল। খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন: 'একথা তুমি উচ্চারণ করলে কি করে ভোম্বল! আমি বেঁচে থাকতে মজুমদার বাড়ীর বউ চাকরি করবে, আর আমি তা চোখ মেলে দেখব?'

সরোজিনী বললেন: 'তোমরা যে ভিতরে ভিতরে একটা কিছু পাকিয়ে তুলছ, তা আমি গোড়াতেই টের পেয়েছিলাম। বেশ করুক বউ চাকরি। আমি কিন্তু এখানে আর থাকব না। আমাকে তাহলে পটলডাঙ্গায় দিয়ে এস।'

পটলডাঙ্গায় সরোজিনীর বড় ভাইয়ের বাসা।

বন্ধু-বান্ধব মহলে চাকুরিবতী স্ত্রী কার কার ঘরে আছে, তার একটা লম্বা তালিকা দিলে সুব্রত।

কিন্তু প্রিয়গোপাল অটল থেকে বললেন: 'যারা করে, তারা করুক। আমাদের বংশে ওসব কোনদিন হয়নি, হবেও না।'

সুব্রতেরও একগুঁয়েমি কম নয়। প্রথমে খুব একচোট তর্ক-বিতর্ক করল বাপের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ বলে বসল: 'বেশ, তাহলে সংসার কিভাবে চলবে, তাই ভাবুন। আমি আমার সাধ্যমত করছি। এক মুহূর্তও তো বসে নেই। কিন্তু এত বড় সংসার একার চাকরিতে চালিয়ে নেওয়া কারোরই সাধ্য নেই আজকাল।'

প্রিয়গোপাল কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। হাতুড়ির ঘায়ের মত লাগল একটা কথা—এত বড় সংসার!

ভোম্বলের সংসার বড় করেছেন তাঁরাই—স্বামী-স্ত্রী আর নাবালক তিনটি ছেলেমেয়ে। সেই খোঁটাই কি তাঁকে দিচ্ছে ভোম্বল? এত বড় আঘাত বুড়ো রুগ্ন বাপকে ভোম্বল দিতে পারল? সে কি কোনদিন ছোট ছিল না? তাকে কি খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে প্রিয়গোপাল মানুষ করে তোলেন নি? নাকি মায়ের পেট থেকে পড়েই ভোম্বল বড় হয়েছে, চাকরি করতে শিখেছে?

দুঃখে, ভাবাবেগে খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কথা বেরুল না প্রিয়গোপালের। তারপর যে অস্ত্র ছেলে তাঁকে ছুঁড়ে মেরেছে, সেই অস্ত্রেই তিনি ফের আঘাত করলেন ছেলেকে। দেখিয়ে দিলেন তারও পৌরুষের, তারও ক্ষমতার ক্ষীণতা। বললেন: 'এত বড় সংসার! কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সবশুদ্ধ সাত আটটি খাইয়ে। কিন্তু সতের বছর বয়সে চোদ্দটি পোষ্য আমি একা ঘাড়ে নিয়েছিলাম ভোম্বল। তার জন্য তোমার মাকে চাকরিতে পাঠাতে হয়নি।'

সুব্রত জবাব দিতে পারত, সেদিন আর নেই। তাছাড়া স্ত্রীর চাকরি করা সে মর্যাদা-হানিকরও মনে করে না। কিন্তু কোন কথা না বলে নিজের সঙ্কল্পে অটুট রইল। প্রিয়গোপাল বললেন, তিনি স্ত্রী আর ছোট ছেলেদের নিয়ে দেশে চলে যাবেন। কিন্তু মাসের শেষে কোথায় পথ-খরচ? নতুন ইংরেজী মাস না পড়লে সুব্রত তাঁকে যাওয়ার খরচও দিতে পারবে না।

তারপর সুব্রতই জয়ী হল। বজায় রাখল তার নিজের জেদ। জেদ না মুক্তিমার্গ।

পরদিন শ্বশুর খেলেন না, শাশুড়ী খেলেন না, বেলা ন'টা বাজতে না বাজতে স্বামীর পাতে খেতে বসতে নিজেরও যেন বাধো-বাধো লাগল আরতির। সরোজিনী গম্ভীর মুখে পরিবেষণ করে গেলেন। অর্ধেকের বেশি ভাত পড়ে রইল পাতে।

সাধারণত রঙীন বেশবাসই আরতির পছন্দ। কিন্তু সেদিন পরল ফিতে পেড়ে সাদা খোলের শান্তিপুরী। গায়ের সাদা ব্লাউজের হাতায় সামান্য

একটু এমব্রয়ডারীর ছোঁয়া, গহনার মধ্যে দু'গাছা করে চুড়ি, আর গলায় সরু হার। মুখে প্রসাধনের ক্ষীণ আভাষ আছে কি নেই। খাওয়ার পরে একটা পান ছাড়া আরতির চলে না, কিন্তু আজ শুধু মুখে তুলল এক টুকরো [illegible] কুচি। পান খেয়ে অফিসে বেরোন শোভন নয়, তাতে ঠোঁট দুটো লাল হয় ঠিকই, কিন্তু দাঁতের কুন্দশুভ্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে না।

তের বছরের ননদ নীলা এসে কানে কানে বলল: 'বউদি, আজ কিন্তু তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

প্রথমে একটু লজ্জিত হল আরতি, তারপর সস্নেহে তার গাল টিপে দিল 'নিন্দুক কোথাকার! অন্যদিন বুঝি খুব কুচ্ছিৎ দেখায়?'

কিন্তু বাসা থেকে বেরুবার মুখে আর এক ফ্যাসাদ বাধল। এক বছরের ছেলে বাবলু তার ছোটপিসীর কোল থেকে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে; মার কাছে যাবে। এদিকে তিন বছরের মেয়ে মন্দিরা এসে আরতির শাড়ির খুঁট মুঠির মধ্যে চেপে ধরেছে: 'আমি চাকরি করতে যাব মা। আমাকেও নিয়ে যাও।'

আরতি মুখ ফিরিয়ে গোপন করল ছল-ছল চোখ। তারপর ফের মেয়ের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসল: 'যেয়ো, তোমার চাকরি ঠিক হোক আগে, তারপর যেয়ো।'

কিন্তু মন্দিরা এখনই যাবে। তার চাকরি ঠিক হয়ে গেছে। আজই তার 'জয়েন' করা চাই।

প্রিয়গোপাল বাসা থেকে বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু সরোজিনী ঘর থেকে বেরুলেন না। জেদ করেই ধরলেন না নাতি-নাতনীকে। বললেন: 'কেন, চাকরি করতে যেতে পারে, ছেলেমেয়ের ব্যবস্থা করে যেতে পারে না? ঝি-চাকর রেখে যাক, ছেলেমেয়ে আগলাবে। আমি কারো ছেলেমেয়ে রাখতে পারব না।'

দুঃখে অভিমানে চোখ সরোজিনীরও ছল্-ছল্ করে উঠল: 'আশা করে বিয়ে দিয়েছিলাম ভোম্বলকে, খুব সুখ হল আমার!'

দাদার ধমক খেয়ে নীলা আর নন্তু সন্তুই জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল মন্দিরা আর বাবুলকে। গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত ছেলেমেয়ের কান্না ভেসে আসতে লাগল। স্বামীর সঙ্গে ট্রামে উঠে পাশাপাশি বসেও সেই কান্নার শব্দই বাজতে লাগল আরতির কানে।

সুব্রত বলল: 'ব্যাপার কি, বার বার বাইরের দিকে কি দেখছ অমন করে?'

আরতি কুণ্ঠিত কাতর স্বরে বলল: 'মনটা ভারি খারাপ লাগছে। অমনিতে ওরা তো আমার কাছে মোটেই ঘেঁষে না। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, কাকা, পিসি—এঁদের কোলে-পিঠেই থাকে। কিন্তু আজ দেখলে তো কাণ্ড?'

সুব্রত ঠোঁটে সিগারেট চেপে সংক্ষেপে জবাব দিল: 'দেখলাম।'

আরতি আর্দ্রস্বরে বলল: 'আজ সারাদিনই ওরা দুজনে বোধ হয় কাঁদবে।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সুব্রত হাসল: কেবল কি দু'জন? আরো একজনের চোখের জলে ভেসে যাবে ক্যানিং স্ট্রীট। এমনি করেই চাকরি করবে তুমি?'

কিন্তু দু' সপ্তাহ যেতে না যেতে আরতি সুব্রতকে দেখিয়ে দিল সত্যিই কি করে চাকরি করতে হয়, এমন যে অফিসনিষ্ঠ সুব্রত, সে পর্যন্ত হার মানল। ভোরে উঠে সংসার-যাত্রা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরতির অফিস-যাত্রার প্রস্তুতিও চলতে থাকে। সকালেই স্নান সেরে নেয়, চায়ের পাটটা কোন রকমে সারে, চোখ বুলায় খবরের কাগজে। কিন্তু রান্নাঘরের পাট নিতান্ত অনিবার্য ভাবেই পড়েছে সরোজিনীর ওপর। আরতি মাঝে মাঝে সাহায্য করতে যায়, মাছ তরকারি কুটে, ধুয়ে দেয়। চাকরি নেওয়ার আগে আরতি যেটুকু করত, বড়জোর সেটুকুই করে। রান্নার প্রধান দায়িত্ব নিতে হয় সরোজিনীকেই। কাজ করতে করতে ক্ষোভ করেন সরোজিনী: 'এসেছি হেঁসেল ঠেলতে, হেঁসেল ঠেলেই যাই। ছেলের বিয়ে দিয়ে খুব সুখ হ'ল আমার।'

প্রায় আটটা থেকেই আরতি নাইতে যাওয়ার তাগিদ দিতে থাকে সুব্রতকে; বলে: 'এখন ওঠ। এর পর বাথরুম খালি পাবে না। লেট্ হয়ে যাবে অফিসে।'

সুব্রত জবাব দেয়: 'আমার লেট্ হবার ভয় নেই, ঠিক সময় গিয়েই পৌঁছব। কিন্তু তুমি না হয় লেট্ এক আধ দিন হলেই।'

আরতি যেন শিউরে ওঠে: 'ওরে বাবা! হিমাংশুবাবু মোটেই তা পছন্দ করেন না।'

মুখার্জি এণ্ড মুখার্জির বয়সের দিক থেকেই জুনিয়ার হিমাংশু মুখুয্যে। কিন্তু আধিপত্যে পদমর্যাদায় তাঁরই সিনিয়রিটি। সাহেবী মেজাজের মানুষ, সময় আর নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক। এক চোখ এ্যাটেনডেন্‌স্ খাতায়, আর এক চোখ ঘড়ির কাঁটায়। কিন্তু সমান চোখে দেখেন সব কর্মচারীকে। মেয়ে-পুরুষ বলে ভেদ করেন না। মেয়েদের জন্য আলাদা বসবার জায়গা অফিসে আছে, কিন্তু তাই বলে মেয়েদের জন্য আলাদা পক্ষপাত নেই তাঁর মনে। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়স। দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন, রূপবান ঠিক বলা যায় না, কিন্তু স্বাস্থ্যে, সপ্রতিভ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে রূপের ত্রুটি চোখেই পড়ে না। অবস্থাপন্ন বড় ঘরের ছেলে। বিয়ে করেছেন মধ্যবিত্ত ঘরের একটি এম-এ পাশ মেয়েকে।

'লাভ্-ম্যারেজ।' বলে মৃদু হেসেছিল আরতি: 'একদিন গাড়িতে এসেছিলেন অফিস পর্যন্ত। ভারি মিষ্টি চেহারা।'

হিমাংশু মুখুয্যের চমৎকার স্বাস্থ্য আর তাঁর স্ত্রীর মিষ্টি চেহারা। কিন্তু সবটুকু গর্ব যেন আরতির নিজের। তার বর্ণনার ভঙ্গিতে সেইরকমই মনে হয়েছিল সুব্রতের।

সুব্রতকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে আরতি তার পাতে অসঙ্কোচে বসে যায় সরোজিনীকে ডেকে বলে: 'দিন মা, কি রান্না হয়েছে। দিন তাড়াতাড়ি।'

এখন আর আরতির পাতে ভাত পড়ে থাকে না। সুব্রতের চেয়েও সে

তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়, দেরি হয়ে গেলে কোনদিন তার পাশেই আর একখানা থালা নিয়ে বসে পড়ে। সরোজিনী সরে যান। নীরা পরিবেশন করতে করতে মৃদুস্বরে বলে: 'আবার আলাদা কেন? এক সঙ্গে বসে গেলেই পারতে বউদি। বেশ হোত দেখতে।'

খুবই স্বাভাবিক বন্দোবস্ত। তবু কোথায় যেন খোঁচা লাগে সুব্রতের মনে।

তারপরে শাড়ি বদলাবার পালা। তিনদিন বাদে বাদে অফিসের শাড়ি বদলায় আরতি। আর একখানা ধুতিতে সুব্রতকে কমের পক্ষে পাঁচ দিন চালাতে হয়। কথাটা একদিন উল্লেখ করায় আরতি বলেছিল: 'মিঃ মুখার্জি 'শ্যাবিনেস্' বড় অপছন্দ করেন। তিনি নিজেও যেমন 'টিপটপ' থাকেন, নিজের অফিসটিকেও তেমনি রাখতে চান।'

কিন্তু আরতির গর্ব কেবল হিমাংশু মুখার্জিকে নিয়েই নয়। নতুন মেসিনের ক্রেতাদের ব্যবহার শেখাতে গিয়ে ভবানীপুর, বালিগঞ্জের নতুন নতুন অভিজাত পরিবারের সঙ্গে প্রায় রোজ আলাপ হয় আরতির। তাঁদের বিচিত্র প্যাটার্নের দোতলা, তেতলা সব বাড়ি। গ্যারেজে গাড়ি পড়ে আছে নতুন নতুন মডেলের, কারো একখানা, কারও বা একাধিক। বাড়ির বড় বড় ঘরগুলি সুপরিচ্ছন্ন, রুচিসম্মত আসবাবে সাজানো। সুদৃশ্য কাচের আলমারিতে রাশি রাশি বাঁধান বই। দেখলে চোখ মুগ্ধ হয়। মেয়েরা প্রায় সবাই রূপবতী। শিক্ষায়, শালীনতায়, মধুর-স্বভাবা। আরতি যেখানেই যায়, আদর-আপ্যায়ন, খাতির-যত্ন পায়। একদিন গিয়েছিল চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে এক মাড়োয়ারীর বাড়ি। সে বাড়ির একটি সুন্দরী বউ নিয়েছে আরতিদের মেশিন। কেবল বউটিই সুন্দরী নয়, তার স্বামীও রূপবান। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স। মাড়োয়ারী হলে হবে কি ভুঁড়ি নেই। আলাপ-ব্যবহারে ভারি সুজন। আসবার সময় তিনি সস্ত্রীক গাড়ি নিয়ে বেরোলেন। আরতিকেও না তুলে ছাড়লেন না।

সুব্রত ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল: 'তুমি উঠতে গেলে কেন তাদের গাড়িতে?'

আরতি জবাব দিয়েছে: 'বা রে তাতে কি হয়েছে? ভদ্রলোক অত ক'রে বললেন, তাছাড়া তাঁর স্ত্রীও তো সঙ্গে ছিলেন। দোষ কি?'

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের খুব কৌতূহল। আরতিদের বাড়ি আর অফিস সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা অবশ্য ইংরেজীতেই হচ্ছিল। তাঁর স্ত্রী ইংরেজী জানেন না, তাঁর সঙ্গে চালাতে হয়েছিল হিন্দী। আর ড্রাইভারটি বাঙালী। ঢাকা জেলার লোক। তার সঙ্গে একেবারে নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার করেছিল আরতি।

'এক সঙ্গে তিন-তিনটি ভাষা—তোমার কোনদিন সুযোগ হয়েছে বলবার?'

আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল, উৎফুল্ল দুটি চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল আরতি।

'কিন্তু ইংরেজী সত্যি সত্যি বলতে পারলে তো?': সুব্রত সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেছিল।

'কেন পারব না? কলোকিয়াল ইংলিশ এডিথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার বেশ রপ্ত হয়ে গেছে।': জবাব দিয়েছিল আরতি।

এই এডিথের কথাও মাঝে মাঝে শুনেছে সুব্রত। আরতির এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান 'কলিগ'। মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী তাকেও নিয়েছেন। সাহেব পাড়ায় কি অন্যান্য অবাঙালী মহলে যেখানে যেখানে মেশিন বিক্রি হয়, সেখানে যায় এডিথ সিমনস্। বয়সে আরতির চাইতে বড়ই হবে। কিন্তু এমন সেজে-গুজে আসে যে ছোট দেখায়। আরতির কাছে তার রূপ-বর্ণনা শুনতে শুনতে বেঁটে, কালো, ঠোঁটে কড়া লিপষ্টিক আর আঙুলের নখে পালিশ লাগানো একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের রূপ সুব্রতের চোখে ভেসে ওঠে।

সুব্রত সাবধান ক'রে দেয়: 'খবরদার ওসব মেয়ের সঙ্গে মোটেই মিশবে না।'

আরতি বলে: 'মিশি কি আর তেমন? এক সঙ্গে কাজ করতে গেলে যতটুকু আলাপ-পরিচয় রাখতে হয় ততটুকুই, তার বেশি না। কিন্তু আগে

কথায় কথায় বলত কি জানো ?—I can't follow you. তোমার ইংরেজী প্রায়ই জার্মান আর ইটালীয়ানের মত শোনায়। তার চেয়ে তুমি হিন্দীতেই বল। আমি হিন্দী জানি।'

কিন্তু আরতি নাছোড়বান্দা। সে যতটা লেখাপড়া শিখেছে, তার সিকির সিকিও এডিথ্ শিখেছে নাকি যে, সে আরতির ইংরেজী উচ্চারণের দোষ ধরতে যায় ?

আরতিও এডিথ্‌কে শুনিয়ে দিয়েছে,—'তুমি 'ফলো' করতে না পারো আমি নাচার মিসেস্ সিমনস্। এতদিন তোমাদের উচ্চারণ আমরা নকল করেছি, তোমাদের বদ বাংলা উচ্চারণ সহ্য করেছি, এখন দয়া ক'রে আমরা যে ইংরেজী বলি, তাই যথেষ্ট। এবার থেকে আমাদের উচ্চারণই তোমাদের রপ্ত ক'রে নিতে হবে।'

স্বামীর কাছে এডিথ্-সমাচার বলতে বলতে খিল খিল ক'রে হেসে উঠেছিল আরতি : 'কি বল, ঠিক বলিনি ?'

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে দেবর, ননদ আর ছেলেমেয়েদের জন্য লজেনস্ আর লেবু, শাশুড়ীর জন্য এক কৌটো ভালো জরদা, অসুস্থ শ্বশুরের জন্য এক ঠোঙা আঙুর, আর স্বামীর জন্য এক টিন ভালো সিগারেট, আর নিজের দুটো ব্লাউসের জন্য দু' গজ অর্গাণ্ডি কিনে এনেছিল আরতি।

সুব্রত দেখে মুখ ভার ক'রে বলেছিল : 'অর্ধেক টাকা বোধ হয় বাজারেই রেখে এলে ?'

আরতি বলেছিল : 'ঈস্! তাই ভেবেছ বুঝি ? এই দেখ।'

হ্যাণ্ডব্যাগের ভিতর থেকে ছোট্ট আর একটি ব্যাগ খুলে একশ টাকার আস্ত নোটখানাই স্বামীকে বের ক'রে দেখিয়েছিল আরতি।

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়ে বলেছিল : 'তাহলে বাকি টাকাটা কোথায় পেলে ? প্রথম মাসেই হিমাংশুবাবু কর্মচারীদের বক্‌শিস্ দিলেন নাকি ?' বলে অদ্ভুত একটু হেসেছিল সুব্রত।

আরতি একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর স্বামীকে ধমকের সুরে বলেছিল : 'ভারি বিশ্রী ধরণ তোমার কথার! বকশিস্ দিতে আসবেন তিনি কোন্ সাহসে? আমি কি ঝি-চাকর? বকশিস্ নয়—পাওনা। হিমাংশুবাবুর দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, আমরা জোর ক'রে আদায় ক'রে নিয়েছি।'

তারপর স্বামীকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বুঝিয়ে দিয়েছিল আরতি। উলেন মেশিন বিক্রির কমিশন। এডিথ্ নিজের বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিক্রি করেছে দুটো, আরতি একটা, মল্লিকা একটা, রমা একটাও না। এজেন্টরা সাড়ে বার থেকে পনের পার্সেণ্ট কমিশন পায়। কিন্তু আরতিরা অফিসে কাজ করে বলে হিমাংশুবাবুর একেবারেই ফাঁকি দেওয়ার মতলব ছিল। হাসতে হাসতে বলেছিলেন : 'এতো আপনাদের নিজেদেরই অফিস। মেশিনটার যত পাবলিসিটি হয়, ততই আপনাদের পক্ষে ভালো, আপনারা তো আর বাইরের কেউ নন, যে আলাদা কমিশন দিতে হবে।'

কিন্তু বড় ঝানু মেয়ে এডিথ। তাকে ভুলানো অত সহজ না। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে তো! তার চোখে মুখে কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে সে নিজে মুখ খোলেনি, আরতিকেই চোখ টিপে দিয়েছিল। কারণ যোগ্যতার জন্য আরতিকে মিঃ মুখার্জী যে বেশ একটু খাতির করেন, তা সবাই জানে। আরতিই বলে কয়ে শেষ পর্যন্ত ফাইভ পার্সেণ্ট কমিশন আদায় করেছে। তার জন্য এডিথ্রা সবাই তার কাছে কৃতজ্ঞ। বেচারা রমা উপ্রি টাকা না পেয়ে মুখ কালো করে ফিরে যাচ্ছিল। আরতিরা সবাই মিলে চাঁদা ক'রে তাকে রেষ্টুরেন্টে খাইয়ে দিয়েছে, সেই সঙ্গে উপহার দিয়েছে ভালো এক কৌটো স্নো।

সেদিন অনেকদিন পরে ভাল সিগারেট টেনেছিল সুব্রত। কিন্তু ঠিক যেন আগেকার মত স্বাদ নেই। অফিসের মাইনে থেকে পুরো টাকা কোনদিনই সুব্রত ঘরে আনতে পারে না। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর রিফ্রেশ-মেণ্ট রুমে টাকা পনের রেখে আসতে হয়। কিন্তু চাকরির প্রথম মাসেই

মাইনে ছাড়া উপ্‌রি এনেছে আরতি। এদিক থেকে তার কৃতিত্ব আছে বই কি! কিন্তু পার্সেণ্ট আর কমিশন কথাগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা কমার্শিয়াল গন্ধ। দামী সিগারেটের সুগন্ধকে তা ডুবিয়ে দিয়েছে।

একশ টাকার নোটখানা প্রথমে শ্বশুরের কাছেই নিয়ে গিয়েছিল আরতি। কিন্তু প্রিয়গোপাল সে টাকা ছোঁন নি। পুত্রবধূর দিকে মুহূর্ত-কাল জলন্ত চোখে তাকিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য, গলায় তাঁর আগুণ ঝরেনি, জল ঝরেছিল! আর্দ্র স্বরে প্রিয়গোপাল বলেছিলেন: 'আমাকে অপমান করতে এসেছ মা?'

শ্বশুরের কথার ভঙ্গিতে আরতির বুকের মধ্যে ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল। একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু মোলায়েম গলায় বলেছিল আরতি: 'না, বাবা, প্রণামী দিতে এসেছি। আজ শুনেছি, আপনার জন্মদিন।'

রুগ্ন, শয্যাশায়ী প্রিয়গোপাল ঝোঁকের মাথায় উঠে বসেছিলেন, মাথা নেড়ে বলেছিলেন: 'না না, ভুল শুনেছ, আজ আমার মৃত্যুর দিন। যত মধুর ক'রেই বল না মা, ওটা প্রণামী না, ঘুষ। তোমরা ঠিকই জানো, এ ঘুষ কোন না কোন রকমে আমাকে নিতেই হবে। তাই এত সাহস তোমাদের।'

জমিদারী সেরেস্তার কাজে ঘুষ তো প্রিয়গোপাল মাঝে মাঝে নিয়েছেন, কেবল প্রজাদের কাছ থেকে নয়, প্রজাদের বউয়েরাও সিকিটা আধুলিটা যে যা পারে দিয়েছে। তারাও বলেছে প্রণামী। তখন হাত ফেরাননি প্রিয়গোপাল। তাদের কাছে হাত পাতাই ছিল দস্তুর। সত্যি সত্যি যেন ন্যায্য প্রণামীই তখন আদায় করেছেন প্রিয়গোপাল। কিন্তু আজ পুত্রবধূর এই প্রণামীর স্বরূপ তাঁর বুঝতে বাকি নেই। তাঁর আদর্শ, তাঁর সংস্কার, তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে মাত্র ওই একশ টাকার একখানা নোটে কিনে নিতে এসেছে আরতি। যৌবনে কি এমন শত শত টাকা রোজগার করেন নি প্রিয়গোপাল? শত শত নোট ওড়ান নি হাওয়ায়?

সরোজিনী কিন্তু ছেলে আর ছেলের বউয়ের পক্ষ নিয়েছিলেন, স্বামীকে

তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন: 'তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে? প্রথম মাসের মাইনে বউটা কত সাধ ক'রে দিতে গেছে, আর তুমি অমন যা তা বলে ওকে কাঁদিয়ে দিচ্ছ? নাও, হাত পেতে নাও।'

কিন্তু প্রিয়গোপাল মাথা নেড়েছিলেন: 'নিতে হয়, তুমি নাও তোমাদের মা।'

তারপর থেকে সবই আবার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। কেবল স্বাভাবিক নয়, আগের চাইতে সচ্ছলও, সব সময়ের জন্য বাসায় একটি ঝি রাখা হয়েছে। বাইরের কাজকর্ম সে সবই করে। ইচ্ছা করলে তাকে দিয়ে রাঁধানোও যায়। কিন্তু জাতে বামুন নয় বলে প্রিয়গোপাল আর সরোজিনী আপত্তি করেছেন। নীলা এতদিন বাড়ীতে পড়ত বউদির কাছে। এবার থেকে তাকেও স্কুলে দেওয়া হয়েছে। অসুবিধার আর তেমন কোন কারণ নেই।

কিন্তু সাংসারিক সুবিধাটাই তো সব নয়। সুব্রতের মনে হয় সংসারের চেহারাটাও দিনের পর দিন বদলে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম হয় পাতে না হয় সঙ্গে খেতে বসত আরতি, আজকাল সুব্রতের আগেই সে বেরিয়ে যায়। তাদের অফিস আধঘণ্টা এগিয়ে এসেছে। সাড়ে ন'টায় বসে আজকাল। আরতিরা আপত্তি করেছিল। কিন্তু কাজের চাপের কথা বলে মিঃ মুখার্জি তাদের নিরস্ত করেছেন, বলেছেন: 'এস্টাব্লিশমেন্ট খরচ তো দেখেছেন? গোড়ায় খেটেখুটে কোম্পানীকে একবার দাঁড় করিয়ে দিন। তারপর দুপুরে বিকালে যখন খুশি আসবেন। কিন্তু প্রথম প্রথম দয়া করে একটু সকাল সকালই আসতে হবে সবাইকে।'

আরতি স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিগূঢ় রহস্যে একটু হেসেছিল: 'সেই ফাইভ পার্সেন্টের জের, বুঝেছ? আমরাও এর ওষুধ জানি, দেখা যাক।'

সুব্রত সংক্ষেপে বলেছিল: 'হুঁ।'

প্রথম দিন কয়েক অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীর সঙ্গে একই ট্রামে উঠত

সুব্রত। ট্রামের হাতলে ঠেকত পরস্পরের হাত, একই বেঞ্চে দুজনে বসত পাশাপাশি। ঠিক গা ঘেষে যে তা নয়, বরং একটু দূরে দূরে ফাঁক রেখে। কিন্তু সেই ফাঁকটুকু ভরে উঠত রোমাঞ্চে। রোমান্স—হ্যাঁ,—বিবাহিতা স্ত্রীর পাশে বসেও রোমাঞ্চ হয়েছে সুব্রতের। আঁটসাঁট ভঙ্গিতে শাড়ি পরে অফিসে বেরোয় আরতি। একটু চটুল স্বভাবের ওপরে পড়ে গাম্ভীর্য্যের আভরণ। ট্রাম-বাসে, পথে-ঘাটে সংযত, গম্ভীরভাবে চলতে সুব্রত শিখিয়ে দিয়েছে স্ত্রীকে, সে উপদেশ আরতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। এমন কি স্বামীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটতে দেয় নি। যেতে যেতে খুব কম কথা হয় দুজনের মধ্যে। যেন সবে সামান্য পরিচয় হয়েছে,—খুলতে শুরু হয়েছে অসামান্য রহস্যের আবরণ। কল্পনা ক'রে ভারি অদ্ভুত লাগে সুব্রতের। প্রেমজ বিবাহ নয় তাদের। বিবাহজ প্রেমের স্বাদ প্রথম বছরে যা ছিল, দ্বিতীয়-তৃতীয় বছরে তা যেন অনেকখানি গিয়েছিল পানসে হয়ে। অফিস যাত্রার প্রথম ক'দিন নতুন ক'রে যেন সেই প্রথম বছর ফিরে এল। একেকবার এমনও মনে হল এ কেবল বিয়েরই প্রথম বছর নয়, প্রাক্-বৈবাহিক কোন প্রেমের প্রথম বছর। আরতি যেন শুধু আর অতি পরিচিতা নিত্যকার জীবনসঙ্গিনী নয়, সেই সঙ্গে মাত্র আধ ঘণ্টার যাত্রা সঙ্গিনীও। সহজলভ্যা স্ত্রীর মধ্যে পরস্ত্রীর সুদূর দুর্ভেদ্য রহস্য-ময় রূপ প্রথম ক'দিন দেখতে পেল সুব্রত।

কিন্তু অফিসের সময় বদলে যাওয়ায় শেষ হ'ল সেই যৌথ যাত্রার রোমান্স। সুব্রতের অনেক আগে আরতি খেয়ে বেরিয়ে যায়। আগে আগে ছুটির দিনে বেলা দু'টোর সময় যখন বন্ধুদের বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরত সুব্রত, দেখত সবাই খেয়ে ঘুমিয়েছে কিন্তু আরতি শুকনো মুখে বসে আছে তার ভাত নিয়ে। সুব্রত রাগ করত: 'তুমি খেয়ে নিলে না কেন? আমার কি আর জায়গা আছে পেটে?'

আরতি বলত: 'তা'হলে আমারও নেই, আমিও খাবনা কিছু।'

বিরক্ত হোত সুব্রত: 'কি যন্ত্রণা!'

কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুসি হোত অনেক বেশী।

সুব্রতের খাওয়ার আগেই আরতি যখন আঁচিয়ে এসে তোয়ালেতে মুখ মুছতে থাকে, তখনকার সঙ্গে এখনকার দিনের তুলনাটা সুব্রতের মনে পড়ে যায়।

কেবল তাই নয়, বিকালে বেশিরভাগ দিনই চা করে, বিছানা ঝাড়ে কুমুদিনী ঝি। কেননা ফিরতে আরতির সন্ধ্যা উৎরে যায়। এসে হাঁপায়। কোন কোনদিন টান হয়ে শুয়ে পড়ে। তখন তাকে গার্হস্থ্য কাজে ডাকা —নিষ্ঠুরতা। কুমুদিনীকে বলে বলে সব কাজই শিখিয়ে দিয়েছে আরতি। সেই সঙ্গে শিখিয়েছে পরিচ্ছন্নতার মাহাত্ম্য। কাজ খুব গুছিয়ে পরিপাটি-ভাবেই করে কুমুদিনী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও দেখতে বেশ স্বাস্থ্যবতী। খুব খাটতে পারে, কাজে আলিস্যি নেই। তবু মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে সুব্রতের। অকারণে বিরক্তি আসে, মেজাজ বিগড়ে যায়। বউয়ের কাজ কি ঝি'কে দিয়ে চলে?

কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য মন খারাপ করবার ছেলে সুব্রত নয়। বউ যদি চাকরি করে, আর সে চাকরিতে যদি সময় আর সামর্থ্য দুইই বেশী দিতে হয়, দাম্পত্য-জীবনের চেহারা তো একটু আধটু বদলাবেই। তাতে আপত্তি নেই সুব্রতের। কিন্তু আরতির মনের চেহারা যেভাবে বদলাতে শুরু করেছে, সেটাকে তেমন সুলক্ষণ বলে ভাবতে পারছে না সুব্রত। আগে ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জার দিকে ভারী লক্ষ্য ছিল আরতির। রোজ নিজের হাতে তাদের কাজল পরাত, পাউডার মাখাত, মাথা আঁচড়ে জুতো পরিয়ে দিত। এসব না করলে আরতি যেন স্বস্তি পেত না। এখন সেসব গেছে। কেবল সময় নেই বলেই নয়, সুব্রতের মনে হয়, যেন মনও নেই। এখন ছুটি-ছাটার দিন ছাড়া ছেলে-মেয়েদের আদর-যত্ন বেশির ভাগই সুব্রতের মা আর ঝিয়ের ওপর দিয়ে আরতি নিশ্চিন্ত হয়েছে।

আরো অনেক কিছুই বদলেছে আরতির। গানের সখ, সেলাইর সখ,

মাসিক কাগজের গল্প পড়বার সখ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। কারণ সময়ে কুলোয় না। যেটুকু সময় পায়, সেটুকু সময়ও মেশিন বিক্রির চিন্তা ঘোরে তার মাথার মধ্যে। মেশিন বিক্রির চেষ্টায় সমস্ত শহরের পরিচিত মহলে ঘুরে বেড়ায় আরতি।

টাকা অবশ্য আসে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কথা আসে কানে। ট্রামে-বাসে বড় বেশি ঘোরে আরতি। বড় বেশি মেশে স্ত্রী-পুরুষ সকলের সঙ্গে। ঘরের বউ-ঝিদের পক্ষে এতটা স্বাধীনতা কি ভালো!

গাঁয়ের যেসব লোক সম্প্রতি শহরে এসেছেন, তাঁরাই বাড়ি বয়ে এ সব খবর দিয়ে যান প্রিয়গোপালকে। তিনি মাঝে মাঝে চটেন, চেঁচান, কোন দিন বা নিতান্ত শান্তভাবে ছেলের কাছে ঘটনাটা বিবৃত করেন মাত্র। ভবানীপুর অঞ্চলের কোন একটা রেস্টুরেণ্টে এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে আরতি নাকি চা খাচ্ছিল। নিজের চোখে দেখেছেন সুব্রতদের গাঁয়ের সুবোধ ভদ্র।

সুব্রত স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিল: 'ব্যাপারটা কি! কোন্ অপরিচিত ভদ্রলোক চা খাইয়েছেন তোমাকে?'

আরতি হেসেছিল: 'ক্ষেপেছ? চা কি অতই সস্তা যে, অপরিচিত [illegible] দল বেঁধে ছ'পয়সা দু'আনা ব্যয় করে আমাকে চা খাওয়াবে? শৈলেনদা তোমাদের ভদ্র মশাইর কাছে অপরিচিত হলে কি হবে আমাদের ফ্যামিলিতে খুবই পরিচিত। বিয়ে করেছেন আমার মামাত বোনের ননদ কল্যাণীকে। শৈলেনদাকে গছালাম একটা মেশিন। নিজের কমিশন থেকে কিছু ছাড়তে হল। শত হলেও কল্যাণীর তো বর! সেই খাতিরে কিছু সস্তায় করিয়ে দিলাম। আর সেই কৃতজ্ঞতায় চা আর ফাউল-কাটলেট খাওয়ালেন শৈলেনদা।'

সেই টাকা আনা পাই, সেই স্থূল ব্যবসায়-বুদ্ধি। এর চেয়ে আরতি যদি বলত, শৈলেনদার একটু দুর্বলতা ছিল আমার ওপর, সেই দিনগুলির কথা মনে করে দু'কাপ চা খেলাম আমরা। তাও যেন সুব্রতের এত অসহ্য লাগত

না কে জানে সম্পর্কটা হয়ত সেই ধরণেরই ছিল। আজ সেই সুবাদে আরতি তার কাছে কমিশনের লোভে মেসিন বিক্রী করে, আর সেই খাতিরে শৈলেন পাঁচ টাকা কমে মেশিন কিনে দু'টাকা ব্যয় করে রেস্টুরেন্টে।

তারপর একদিন সুব্রত সত্যিই গিয়ে হাজির হল আরতিদের ক্যানিং স্ট্রীটের অফিসে। যাবে যাবে প্রথম থেকেই ভাবছিল, কিন্তু সংকোচের কাছে হার মেনেছে কৌতূহল। স্ত্রীর অফিসে গিয়ে পরিচয় দিতে হবে: 'আমি অমুক দেবীর স্বামী!' অন্যের কানে সেটা কৌতুকের মত শোনালেও নিজের মুখে যেন এখনও বাধে। তবু সুব্রতের শেষ পর্যন্ত মনে হল, হিমাংশুবাবুর সঙ্গে একবার গিয়ে দেখা করা দরকার। তাঁকে বলতে হবে এ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় যে-সব সর্ত ছিল, তা তিনি পুরোপুরি মানছেন না। মানে পুরোপুরি ষোল আনার ওপরে আঠারো আনা আদায় করে নিচ্ছেন। কনফাইনমেন্ট বেশী করেছেন, খাটুনি বাড়িয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একবার খোলাখুলি আলাপ করা দরকার।

অফিস থেকে ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে সুব্রত গিয়েছিল। ক্যানিং স্ট্রীটের মুখার্জি এণ্ড মুখার্জিতে।

নীচের তলায় স্টেশনারী দোকান। সেখানে দুটি অপরিচিত বাঙালী মেয়েকে দেখতে পেল সুব্রত। পুরুষ ক্রেতাদের ভিড় জমেছে। প্রৌঢ় গোছের আরো দুজন কর্মচারী কাজ করছেন একদিকে, কাউণ্টারের আর একদিকে বসেছেন বুড়ো ক্যাশিয়ার। সেখানে আরতি নেই। ভাগ্যই বলতে হবে সুব্রতের যে, স্ত্রীর সঙ্গে এখানে চোখাচোখি হয়নি। হিমাংশু মুখার্জির নাম করতে দরোয়ান নিয়ে গেল দোতলায়। চেয়ার, টেবিল, ফ্যান, ফোনে সাজানো, পুরো অফিস। জন চার পাঁচ লোক মাথা গুঁজে কাজ করছে। আরতিদের সঙ্গে এখানেও দেখা হ'ল না।

নাম লিখে স্লিপ পাঠাতে সঙ্গে সঙ্গে সাদর আহ্বান এল। হিমাংশু নিজেই উঠে এসে তাকে নিয়ে গেলেন নিজের কামরায়: 'আসুন, আসুন।'

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়ে বললে : 'আপনি কি চেনেন আমাকে ?'

হিমাংশুবাবু একটু হাসলেন : 'না চিনবার কি আছে ? মিসেস মজুমদারের অফিসিয়াল চিঠিপত্র তো আপনার কেয়ারেই যায়। 'প্রপার নেম' আমি ভুলিনা। তা ছাড়া দূর থেকে একদিন আপনাকে দেখিয়েওছিলেন মিসেস মজুমদার। ওঁকে অনেকদিন বলেছি আপনাকে নিয়ে আসতে। কিন্তু আপনার বোধ হয় সময় হয়নি। ওঁরও সঙ্কোচ ছিল হয়ত !'

সুব্রত বলল : 'না, সঙ্কোচের কি আছে ?'

'সত্যিই কিছু নেই। আমরাও পূর্ববঙ্গের মানুষ মশাই। অত সঙ্কোচ-টঙ্কোচের ধার ধারিনে। দেশের মানুষ দেখলে রেখেঢেকে আলাপ করতে জানিনে। একেবারে প্রাণ খুলে দিই।'

সুব্রত খুসী হ'ল : 'ও আপনিও পূর্ববঙ্গের ? কোন্ জেলার ?'

সিগারেটের কৌটা এগিয়ে দিতে দিতে হিমাংশুবাবু হাসলেন : 'খোদ ঢাকার। আপনাদের বাড়ীও তো মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশনে ? সবই শুনেছি।'

দেশলাই জ্বেলে প্রথমে সুব্রতের সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন হিমাংশুবাবু তারপর ধরালেন নিজের, সত্যিই খুব বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মিহি ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবিতে চমৎকার মানিয়েছে। চওড়া কপাল, বড় বড় চোখ, গোল গোল ভরাট মুখ, ছাইদানিতে সিগারেট ঝাড়লেন হিমাংশুবাবু। সুব্রত লক্ষ্য করল তাঁর হাতের দু'আঙুলে দু'টো হীরের আংটি জ্বলজ্বল করছে।

হিমাংশুবাবু আর একবার আত্মপরিচয় দিলেন : 'সব বাঙাল মশাই, কোন চিন্তা করবেন না। বাঙালে বাঙালে ছেয়ে ফেলেছি আমরা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় বার আনি তুলে আনতে হ'ল পাকিস্থান থেকে। কিন্তু চুপচাপ বসে তো আর থাকা যায় না হাত পা কোলে করে। ভাবলাম দেখি কপাল ঠুকে, আর ঢিল ছুঁড়ে। ভাগ্য পরীক্ষা করতে আমরা পূর্ববঙ্গের লোক তো কোনদিন পিছ-পা নই। আর পূর্ববঙ্গের লোক ছাড়া হঠাৎ মেয়েদের জন্ত

এমন একটা নিউ এভিনিয়ু কেইবা খুলতে সাহস করত? পূর্ববঙ্গের লোক না হলে আপনিই কি এত সহজে পাঠাতেন আপনার—'

হঠাৎ থেমে গেলেন হিমাংশুবাবু, ছাইদানিতে সিগারেটের মুখটা ফের একটু ঝেড়ে নিয়ে হাসলেন: 'একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে সুব্রতবাবু। মিসেস মজুমদার বউবাজারের দিকে বেরিয়েছেন একটু।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিমাংশুবাবু বললেন: 'আর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

সুব্রত এবার বলল: 'আউটডোর ডিউটিটাই বোধ হয় বেশী আপনার এখানে?'

হিমাংশুবাবু স্নিগ্ধ সৌজন্যে হাসলেন: 'আজ্ঞে, তা একটু বেশী। নতুন ধরণের মেশিন। প্রথম দিকে পুশিং সেলের দরকার, তারপর একবার চালু হয়ে গেলে—তবে একথা মনে করবেন না যে, প্রকাশ্যভাবে ক্যানভাস্ করবার জন্য মেয়েদের আমরা বাইরে পাঠাই। ওঁরা ডিমনস্ট্রেট করেন, কি ভাবে হ্যাণ্ডল্ করতে হয় শিখিয়ে দেন। মিসেস্ মজুমদার এদিক থেকে খুব এফিসিয়েণ্ট হ্যাণ্ড। যেসব পার্টির বাড়ী তিনি গেছেন, সব জায়গা থেকে আমরা খুব ভালো রিপোর্ট পেয়েছি। যে বাড়ীতে মিসেস মজুমদার যান, সে বাড়ীতে অন্য কোন মেয়েকে পাঠাবার উপায় নেই। পার্টির পছন্দ হয় না, তাঁরা খুঁৎ খুঁৎ করেন। মিসেস মজুমদারকে ছাড়া চলে না তাঁদের। আলাপ আলোচনায়, কাজে সব দিক থেকে তিনি পার্টিকে খুসী করতে পারেন।'

বসে বসে স্ত্রীর প্রশংসা শোনে সুব্রত।—অন্য একজন পুরুষের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা। চাকরিতে পাঠাবার সুযোগ না হলে স্ত্রীর এসব গুণ সুব্রতের কাছে অনাবিষ্কৃত থাকত।

চা এল। সেই সঙ্গে চলল দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা। হিমাংশুবাবু বললেন: ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন সুবিধে করা যাচ্ছে না। দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে ব্যাপার। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের আড়ত থেকেও এইরকম সব খবর আসছে।

নিজের অভিযোগগুলি উত্থাপন করবার ঠিক যেন সুযোগ পেল না সুব্রত শুধু ছাড়া কেমন যেন নিরর্থকও মনে হ'ল সে সব কথা।

একটু বাদে সত্যিই এসে উপস্থিত হ'ল আরতি। পিছনে পিছনে চাকর এসেছে ছিট কাপড়ে ঢাকা লম্বা মস্ত একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে,—অনেকটা সেতারের মত দেখতে। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র নয়, সীবন-যন্ত্র।

স্বামীকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হ'ল আরতি, সুব্রতও হঠাৎ কি বলবে ভেবে পেলো না।

কিন্তু হিমাংশুবাবুর সপ্রতিভতা অটুট আছে। হেসে বললেন: 'আসুন মিসেস মজুমদার, আমাদের নতুন একজন কাষ্টমার এসেছেন।'

আরতি লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল: 'কখন এসেছে?'

'এই খানিকক্ষণ।'

হঠাৎ আর একদিনের কথা সুব্রতের মনে পড়ে গেল। বিয়ের বছর খানেক পরে আরতির কলেজের একজন বন্ধু এসেছিল দেখা করতে। ভারি লাজুক নম্রস্বভাবের ছেলে, নাম ছিল বুঝি পুলিন। খানিকটা ভয়, খানিকটা ঈর্ষার চোখে তাকাচ্ছিল সে সুব্রতের দিকে। সুব্রত পরম দাক্ষিণ্যে মুখ মুচকে হেসেছিল। তারপর আরতি ঘরে ঢুকতে প্রায় ঠিক এই ভঙ্গিতেই বলেছিলো: 'এস আরতি, দেখো, কে এসেছেন, চিনতে পারো নাকি?'

সে দিন আরতি আর পুলিন কেউ কোন কথা বলতে পারেনি। কিন্তু হিমাংশুবাবু আর আরতির সম্পর্ক এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। হিমাংশু বাবু তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নন, স্ত্রীর শ্রমের অংশীদার। মাত্র একশটি টাকা দিয়ে আরতির বেশীর ভাগ শ্রম আর সামর্থ্যকে তাঁরা কিনে নিয়েছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে সেই জন্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে সেবা-শুশ্রূষা পাচ্ছে না সুব্রত। এখানে পুলিনের মতই তার অবস্থা। কিন্তু সুব্রত ভেবে দেখল যতক্ষণ আরতি চাকরি করছে হিমাংশুর অফিসে ততক্ষণ নিজের ষোল আনা স্বামীত্বের দাবী তোলবার কোন মানে হয় না। স্ত্রীর দেহ মন তারই। কিন্তু দৈহিক শ্রমের দশ আনার সরিক হিমাংশু মুখার্জি।

তারপর সুব্রতের সামনেই হিমাংশু আরতির সঙ্গে অফিস সংক্রান্ত আলোচনা সুরু করল। ঠিক যেমন পুলিনের সামনে আরতির সঙ্গে সুব্রত পারিবারিক সাংসারিক আলোচনা তুলেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল কি কি আসবে বাজার থেকে, বাবার জন্ম আজই ডাক্তার ডাকা দরকার হবে নাকি।

হিমাংশুও তেমনি বলতে লাগলেন: 'মল্লিকদের ওখানে আর ক'দিন যেতে হবে আপনাকে? হ্যাঁ, শ্যামবাজার থেকে যে তিনটা অর্ডার আসবার কথা ছিল—'

নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল সুব্রত। যে কথা বলবার জন্ম সে এসেছিল, হিমাংশুবাবুই তা অন্য ভাষায় বলে দিলেন: 'আসবেন মাঝে মাঝে, ভারি খুশি হব পায়ের ধুলো দিলে। একদিন মিসেসকে নিয়ে যাবেন না আমাদের একডালিয়া রোডের বাড়িতে। আমার স্ত্রী ভারী খুশি হবেন।'

এই গেল ভূমিকা। তারপর হিমাংশুবাবু নিজেই সুব্রতের দুঃখে সহানুভূতি দেখাল: 'মিসেস মজুমদার অবশ্য কিছু বলেন না, তবু বুঝি, ছেলেপুলে নিয়ে সংসার—এতক্ষণ আটকা থাকতে খুবই কষ্ট হয়! সবই বুঝি। আমরাও তো গৃহস্থ মানুষ, ঘর-সংসার আছে। কিন্তু বুঝেও কি করব বলুন? সবাই মিলে খেটেখুটে বিজনেসটা তো আগে দাঁড় করাতে হবে। যা দিনকাল পড়েছে, আর যা বাজার, দেখতেই তো পাচ্ছেন। এই হিউজ্ এষ্টাব্লিশমেণ্ট চার্জ দিয়ে কিছু থাকে না মশাই, কিছু থাকে না—'

ফিরে এসে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সুব্রত একটা পার্টটাইম জোটাবার। ইন্সিওরেন্সের এজেন্সীর কাজ সুব্রত প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, ফের সুরু করল বেরুতে। দু'তিনটে কেস জুটলও, আর জুটল পার্টটাইম। পাঁচটার পরে ছোট্ট একটা পারফিউমারী ফার্মে তাদের হিসাবের খাতাপত্র-গুলি দেখে দিতে হবে। মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের ব্যাপার। প্রথম মাসে ষাট টাকা করে দেবে তারা তারপর কাজ-কর্ম দেখে সত্তর। ছুটির দিনে লাইফ

ইন্সিওরেন্সের এজেন্সী নিয়ে বেরুলে মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা সহজেই রোজগার করতে পারবে সুব্রত। সুতরাং এবার সে আরতিকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে।

কিন্তু আরতি ছাড়বে না। তার কত হিসাব, কত যুক্তি, কত রাগ, কত কাকুতি-মিনতি! চাকরি আরতি করবেই। চাকরির মোহ—নিজের হাতে টাকা রোজগারের মোহ তাকে পেয়ে বসেছে। তা সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। সংসারের তহবিল সরোজিনী রাখতে রাজী হননি। হিসাবপত্রের ঝামেলা তিনি পোহাতে চান না। খরচের টাকা আরতির কাছেই থাকে। মাসের প্রথম মাইনে পেয়ে সব টাকা সুব্রত তো আরতির হাতেই তুলে দেয়। কিন্তু শুধু সেই কটা পেয়ে তৃপ্তি নেই আরতির। তার নিজের হাতে রোজগার করা চাই। কেবল সুব্রতের হাত থেকে টাকা নিয়ে সে খুসী নয়, আট ন' ঘণ্টা খাটুনির বিনিময়ে টাকা নেওয়া চাই তার হিমাংশু মুখুয্যের হাত থেকেও

রাত্রে অত করে নিষেধ করা সত্ত্বেও পরদিন সুব্রতের চোখের সমুখ দিয়ে ফের সেজেগুজে হাই-হিল জুতো পরে অফিসে বেরুল আরতি

সুব্রত বলল: 'তুমি আবারও যাচ্ছ!'

আরতি স্বামীর কাছে এগিয়ে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল তারপর মিষ্টি একটু হেসে বলল: 'হ্যাঁ যাই, আজ আর অত রাত হবে না। ছ'টার মধ্যেই ফিরব।'

সুব্রত বলল: 'তবু তুমি যাবেই!'

আরতি তেমনি হাসিমুখে বলল: 'না গেলে চলবে কি করে? তা ছাড়া অফিস তো? একটা নিয়ম-কানুন আছে। নিজেও তো অফিস কর। সেসব যে না জানো, তা তো নয়। হুট্ করে কি ছেড়ে দিয়ে আসা যায়? নোটিশ-ফোটিশ দিতে হয় তো একটা?'

অফিস থেকে ফিরে আসবার পর সুব্রত ফের জিজ্ঞেস করল: 'দিয়েছিলে নোটিশ?'

আরতি তেমনি হেসে জবাব দিয়েছিল: 'সেব। এত বাস্ত কেন? ক্ষেপে গেলে নাকি?'

সুব্রত কঠিন স্বরে বলেছিল: 'ক্ষেপে এখনো যাইনি, কিন্তু তুমি বোধ হয় সত্যিই ক্ষেপিয়ে ছাড়বে।'

দিন পনের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল সুব্রত। ঠিক পুরোপুরি ধৈর্য নয়, মাঝে মাঝে দাম্পত্য-কলহ চলতে লাগল। এমন ভয় পর্যন্ত দেখাল: 'তোমার হয় চাকরি ছাড়তে হবে, নয় আমাকে। চাকরি যদি করতে হয়, অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা কর।'

আরতি মাঝে মাঝে চটে ওঠে: 'বেশ তো। তাই হবে।'

কিন্তু অফিস থেকে ফেরার পথে সেই দিনই হয়ত নিয়ে এল সুব্রতের ছোট ভাইদের জন্য জামা প্যাণ্ট, নিজের ছেলেদের জন্য চকোলেট, সুব্রতের জন্য রজনীগন্ধার তোড়া, কিংবা দামী সুগন্ধী এক পাউণ্ড চা।

তারপর নিজের হাতে চা করতে বসে।

সুব্রত জিজ্ঞেস করে: 'আজও বুঝি মেসিন বিক্রি হ'ল একটা?'

আরতি সে কথার জবাব না দিয়ে বলে: 'চা'টা কেমন? খুব ভালো গন্ধ বেরুচ্ছে না?'

সুব্রত সে কথার জবাব না দিয়ে চায়ের কাপটা ঠেলে সরিয়ে রাখে। অর্ধেক চা-ই পড়ে থাকে বাটিতে।

প্রিয়গোপাল সরোজিনী আজকাল আর কোন কথা বলতে চান না। আরতির অসাক্ষাতে সুব্রতকে বলেন: 'আমরা আর কি বলবো বাবা? বলবার মুখ কি তুমি রেখেছ? করো তোমাদের যা খুশী।'

বাপ-মার ওপর রাগ করে ফোনে শ্বশুরকেও একদিন খুব শাসিয়ে দিল সুব্রত: 'চরম কিছু করবার আগে আপনাকে জানিয়ে রাখা কর্তব্য মনে করছি। শেষে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।'

কোর্টে আসামীর পক্ষসমর্থনের সময় কিছু কিছু অসংলগ্ন কথা বলায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একবার ধমক খেয়েছেন নিবারণ বাঁড়ুয্যে। বার-

লাইব্রেরীতে এসে জামাইয়ের কাছে ফোন মারফৎ ফের ধমক খেয়ে আরো ঘাবড়ে যান। এক হাতে টেকো মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলেন: 'ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। হয়েছে কি তোমাদের?'

সুব্রত ধমকে ওঠে: 'যদি বুঝতে চান, please come down here.

'কোথায়, তোমার অফিসে?'

'বেশ, বাসায় আসুন। সে-ই ভালো।'

বাসায় এলে শ্বশুরকে সংক্ষেপে সবই বলে সুব্রত: 'আরতির ব্যবহার চাল-চলন অত্যন্ত আপত্তিকর হয়েছে। যদি এখনও আমার কথামত না চলে আমাকে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

নিবারণবাবু বলেন: 'ওকে চাকরি-বাকরিতে দেওয়া আমার তো গোড়া থেকেই অনিচ্ছা ছিল। প্রকারান্তরে নিষেধও করেছিলাম কিন্তু তা তো কেউ শুনলে না।'

তারপর মেয়েকে ডেকে ধমকে দেন: 'এসব কি হচ্ছে খুকি? তুই নাকি কথাবার্তা কিছু শুনিসনে? সুব্রত যখন ছেড়ে দিতে বলছে ছেড়ে দে চাকরি। কেবল টাকা টাকা করছিস কেন? সংসারে টাকাটাই কি সব? টাকার এতই যদি তোর দরকার পড়ে থাকে—'

নিবারণবাবু থেমে গেলেন, বলতে যাচ্ছিলেন: 'নিস আমার কাছ থেকে।' কিন্তু বললেন না। জামাই কি ভাববে! তাছাড়া যা দিনকাল নিজের সংসারই চালান কঠিন। মেয়ে হাত পাতলে সত্যিই কি কিছু দিতে পারবেন তিনি?

চা জলখাবার দিতে এসে স্বামীর দিকে ক্রুদ্ধ তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাল আরতি; কিন্তু বাবাকে হাসিমুখেই বলল: 'লীগাল প্রাকটিশনার হয়ে তুমি এমন বে-আইনী কাজ করছ কেন বাবা?' ট্রেসপাসের দায়ে পড়ে যাবে যে।'

নিবারণবাবু গম্ভীর হয়ে থাকেন। তারপর আর বেশীক্ষণ থাকেন না। কাজের অজুহাতে উঠে চলে যান।

তারপর চলল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা বন্ধ আর অসহযোগিতার পালা।

আরতি বলেছিল : তুমি শেষ পর্যন্ত বাবার কাছে নালিশ করতে গেলে!'

সুব্রত জবাব দিয়েছিল : 'নালিশ নয়, তিনি তোমার বাবা, তাঁকে জানিয়ে রাখা সঙ্গত মনে করলাম।'

কথা বন্ধ হ'ল, কিন্তু অফিস যাওয়া বন্ধ হ'ল না আরতির। অদ্ভুত এক জেদে পেয়ে বসেছে তাকে। পারতপক্ষে সংসারের সমস্ত কাজই সে করে। অফিসের পরেও এসে খাটে সংসারের জন্য। আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করে। কিন্তু এ সমস্তই যে তার জেদ, সে কথা বুঝতে কারো বাকি থাকে না। ছেলের অশান্তির কথা ভেবে প্রিয়গোপাল আর সরোজিনীর মন খারাপ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দু'চার কথা বলতেও যান সরোজিনী। কিন্তু এ প্রসঙ্গ ওঠামাত্রই আরতি কাজের অজুহাতে নিজেই উঠে যায় সেখান থেকে।

একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকে সুব্রত আর আরতি। ছেলে-মেয়েরা থাকে সরোজিনীর কাছে। কিন্তু এত ঘন সান্নিধ্যে থেকেও কোন কথা হয় না। পিছন ফিরে-শোওয়া আরতির উদ্ধত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে এক একবার সুব্রতের হাত নিস্-পিস ক'রে ওঠে। অতি কষ্টে সংযত রাখতে হয় নিজেকে।

এভাবে আর চলে না। সুব্রত স্থির করল, কিছুদিন আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করাই ভালো। ফের ফোন করল শ্বশুরকে : 'কিছুদিন ওকে আপনি নিজের কাছে নিয়ে রাখুন। সব দিক ভেবে আমি এই প্ল্যান নেওয়াই ঠিক করেছি। আর এই last attempt. মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে।'

শ্বশুর জবাব দিলেন : 'সেই ভালো। আমি কালই কোর্টের পর ওকে গিয়ে নিয়ে আসব। কড়া শাসনেরই দরকার হয়ে পড়েছে ওর।'

শ্বশুরের বশ্যতা আর সহযোগিতায় মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল সুব্রতের কিন্তু সেই দিনই বিকালে একটা আকস্মিক কাণ্ড ঘটে গেল। ব্যাঙ্কের

ম্যানেজার এসে বললেন : 'এক কাজ করুন, ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে সব ক্যাশ বুঝে নিয়ে পাঠিয়ে দিন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের হেড অফিসে। নিজেদে কোন রিস্‌ক্ নিয়ে কাজ নেই।'

এ্যাকাউন্টান্ট সুব্রত বলল : 'সে কি ? আমাদের ব্যাঙ্ক তো সাউণ্ড দু'দিন ধ'রে সামান্য একটু 'রাণ' হচ্ছে, কিন্তু তাতে—'

ম্যানেজার বললেন : 'আরে মশাই যা বলছি, তাই করুন। সবই কর্তার ইচ্ছায়, আমরা কি বুঝি ? বুঝতে চান তো ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ী চলে যান।'

ফোনে হেড অফিসের সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কি আলাপ ক'রে ছুটির পরে ম্যানেজার তাকে ডেকে নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললেন : 'ভালো চান তো কাল আর আসবেন না, পাবলিকের হাতে মারধোর খেতে হবে ত হলে। যতটা বুঝতে পারছি, আজ রাত্রেই তালা পড়বে।'

সুব্রত বলল : 'তার মানে ?'

'মানে জানেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

পরদিন সুব্রতও জানল। সহরের আর যারা জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিল, তাদের কাছেও খবরটা অবিদিত রইল না। তাদের টাকা গেছে, সুব্রতের গেছে চাকরি। সেভিংস্ এ্যাকাউণ্টে শ' খানেকের বেশি ছিল না। কিন্তু তার চাইতেও দুশো টাকার চাকরির শোকটাই সুব্রতকে মুহ্যমান ক'রে রাখলো।

বিকালের অনেক আগেই নিবারণবাবু এসে পৌঁছলেন। আরতিকে নেওয়ার প্রসঙ্গটা চাপা পড়ল। কারণ, নিবারণবাবুরও হাজারখানেকের একটি সেভিংস এ্যাকাউণ্ট ছিল জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্কের হাইকোর্ট শাখায়। সুব্রতই গরজ ক'রে খুলিয়েছিল এ্যাকাউণ্টটা।

নিবারণবাবু খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে শান্তভাবে বললেন, 'তোমার আর দোষ কি ? তবে তোমরা ভেতরে ছিলে, কেন যে খবরটা আগে দিতে পারনি তাই ভাবি। অফিসে কেবল ঘাড় নিচু ক'রে কলম পিষলেই কি

দুনিয়াটা চলে ? আমার যা গেছে যাক। কিন্তু এখন থেকে চোখ কান খোলা রেখে চলতে শেখ।'

আরতি এবার মুখ খুলল : 'তুমি ভেব না বাবা। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা যদি শেষ পর্যন্ত আদায় না-ই করা যায়, আমি বছর দুইয়ের মধ্যে তোমার সব টাকা শোধ ক'রে দেব।'

পরদিন থেকে ফের পুরো দমে অফিস চলল আরতির। অনেক সকালে বেরোয়, অনেক রাত্রে ফেরে। মেশিন বিক্রির কমিশনের জন্য টালা থেকে টালীগঞ্জ টহল দিয়ে বেড়ায়। কেউ কোন কথা বলে না।

সুব্রতও চাকরির চেষ্টায় বেরোয়। মাঝে মাঝে দেখা হয় আরতির সঙ্গে। কোন কোন দিন তার সঙ্গে সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখা যায়। সুব্রত কিছু বলবে বলবে ভাবে। কিন্তু বলে না। আগে চাকরি জুটুক একটা।

সুব্রতের আগে আরতিই কথা বলল : 'অত ভাবছ কেন ? চলেই যাবে। একরকম ক'রে।'

সুব্রত বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলে : 'আমি কি বলছি যে চলবে না ?'

স্বামীর অন্যমনস্কতা দূর করবার জন্য মাঝে মাঝে অফিসের গল্পও করে আরতি। কিন্তু ছ' মাস আগের গল্পের সঙ্গে এখনকার গল্পের মিল নেই। ভবানীপুর, বালীগঞ্জের সেই সব বড় বড় লোকের বাড়ীঘর ঠিকই আছে। সেই গ্যারেজ গাড়ী, কার্পেট-মোড়া ঘরে দামী দামী সব আসবাব, সব ঠিকই আছে, কিন্তু তার ভিতরকার চেহারা যেন বদলে গেছে, আরতির চোখে। আরতি গল্প করে আজকাল—মাত্র মিনিট পনের দেরি হওয়ায় রাসবিহারী এভেন্যুয়ের ব্যারিষ্টার এইচ এন হালদারের মেয়ে শুচিস্মিতা তাকে কিভাবে তিরস্কার করেছে। ট্রামের গোলমালেই দেরি হয়ে গিয়েছিল আরতির। কিন্তু শুচিস্মিতার ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, কথাটা তার বিশ্বাস হয়নি। বলেছিল : 'যে জন্যই হোক, আমার তো সময় অনেকখানি নষ্ট করলেন আপনি। বসে বসে অপেক্ষা করছি তো করছিই, আপনার আসবার নাম

নেই। আমি এক্ষুনি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু নেহাৎ যাতায়াতে আপনার কতকগুলি পয়সা দণ্ড যাবে—'

আরতি সুব্রতের কাছে মন্তব্য করেছিল: 'মেয়েটিকে যা ভেবেছিলাম তা নয়।'

বড়বাজারের লৌহ ব্যবসায়ী রসময় প্রামাণিকের বাড়ীতেও একটা মেশিন বিক্রি হয়েছে আরতির। তাঁর পুত্রবধূ কমলাকে সেদিন উলেন মেশিনের ব্যবহার শেখাতে গিয়েছিল আরতি। গেলে খুব আদরআপ্যায়ন করে কমলারা। চা-জলখাবার খাওয়ায়। ঘরসংসারের কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কিভাবে মেশিনটা হাণ্ডেল করতে হয়, তা তিন চারদিন দেখাবার পরেও যখন কমলা ধরতে পারেনি, আরতি তখন একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিল: 'আঃ কি করছেন আপনি? হয় আপনার মন নেই এদিকে, নয় বুদ্ধি-শুদ্ধির অভাব আছে।'

বলেই অবশ্য হেসে ফেলেছিল আরতি।

কিন্তু কমলা হাসেনি। রাগে তার সমস্ত মুখ ফেটে পড়েছিল, বলেছিল: 'আপনি আজ যেতে পারেন। আজ মেশিন নিয়ে বসবার সময় নেই আমার।'

কিন্তু কেবল এতেই ব্যাপারটা শেষ হয়নি। কমলার শাশুড়ী উপস্থিত ছিলেন সেখানে; তিনি জবাব দিয়েছিলেন: 'আমাদের ঘরের মেয়ে-ছেলেদের বুদ্ধি শুদ্ধি একটু কম থাকলে ক্ষতি নেই মা। যেটুকু আছে, তাতেই আমাদের চ'লে যায়। আমাদের ঘরের বউ-ঝিদের তো আর বেটাছেলের মত বাইরে বেরুতে হয় না, জিনিস ফিরি ক'রে বেড়াতে হয় না লোকের বাড়ি বাড়ি! গেরস্ত ঘরের মেয়ে-ছেলের বুদ্ধি একটু কম থাকাই ভালো।'

আরতি অবাক হয়ে গিয়েছিল। কমলা সেদিন কিছুতেই আর সেলাই নিয়ে বসেনি। কমলার স্বামী নিরঞ্জনবাবু নাকি আরতিদের অফিসে তাই নিয়ে রিপোর্টও করেছেন। হিমাংশুবাবু মৃদু তিরস্কারের সুরে বলছিলেন স কথা।

যা বেশ বোঝা যায়, এসব অপ্রীতিকর গল্প স্বামীর কাছে আরতি করতে চায় না। কিন্তু চেপে রাখতে রাখতে কি ক'রে যেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিসের একটা ঝাঁজ যেন ফুটে বেরোয় গলায়। কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না আরতি।

সুব্রত সাবধান ক'রে দেয়: 'খবরদার' এখন কিন্তু মেজাজ দেখাবার সময় নয় আমাদের। খুব সাবধানে, খুব হিসাব ক'রে চলতে হবে। এসব রিপোর্ট-টিপোর্ট যাওয়া ভালো কথা নয়। সংসারের অবস্থাটা তো দেখছ।'

আরতি ম্লান একটু হাসল: 'না দেখে কি জো আছে? হিসাব-জ্ঞান কারো চেয়ে আমার কম নয়। ভেব না।'

ফের চাপাচাপি চলল সংসারে। ঝি ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। দুধ, কয়লা, চা, ধোপা—সব খরচের ছাঁটাই হ'ল যথাসম্ভব। সময় বুঝে শাশুড়ীও রোগে পড়লেন। বাড়ী আর অফিস একাই প্রায় সামলাতে হয় আরতিকে। চাকরির চেষ্টায় বেরোবার আগে সুব্রত স্ত্রীকে রান্না আর ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করে। স্ত্রীকে বলে: 'দেখ যেন লেট্-ফেট্ না হয়। এ সময় ইরেগুলারিটি ভালো হবে না।'

কিন্তু অফিস থেকে ফিরবার সময় আরতির মুখ প্রায়ই শুকানো শুকনো দেখা যায় আজকাল। সুব্রত জিজ্ঞাসা করলে বলে: 'কিছু নয়। খাটুনি তো একটু বেশিই পড়ে আজকাল, তাই।'

সুব্রত একদিন ধরে বসল: 'সত্যি ক'রে বল তো অফিসে গোলমাল-টোলমাল চলছে নাকি কিছু?'

আরতি হেসে নিশ্চিন্ত ক'রে দিল স্বামীকে: 'না না, গোলমাল আবার কি হবে? তবে মিঃ মুখার্জীর মেজাজ একটু খিট-খিটে হয়ে আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা, তা আমরা কি করব? আমরা তো চেষ্টার কোন ত্রুটি করছি না।'

সুব্রত বলল: 'তোমাকে বলছেন না কি কিছু ?'

'আমাকে আবার কি বলবেন ?'

সুব্রতের মনে হ'ল তবে আরতির সম্বন্ধে ভালো ধারণাই আছে মিঃ মুখার্জীর।

আর একদিন সামান্য একটু উত্তেজিত দেখাল আরতিকে। সুব্রত বলল: 'কি ব্যাপার ?'

আরতি হাসতে চেষ্টা ক'রে বলল: 'কিছু না। কমিশন নিয়ে সামান্য কথান্তর হয়ে গেল হিমাংশুবাবুর সঙ্গে।'

সুব্রত বলল: 'কথান্তর!'

আরতি বলল: 'আমার সঙ্গে নয়, এডিথের সঙ্গে। মিঃ মুখার্জী বলেছিলেন—এক মাসে তিনটা মেসিন যদি বিক্রি করতে পারি, ফাইভ পার্সেন্টের বদলে টেন পার্সেন্ট কমিশন দেবেন। এ মাসে এডিথ বিক্রি করেছে চারটে আর আমি তিনটে। কিন্তু মিঃ মুখার্জী এখন তাঁর কথা উইথড্র করছেন। বলছেন, অত্যন্ত ডাল মার্কেট, এদিকে হিউজ এষ্টাব্লিশমেন্ট চার্জ। এ সময় যদি আপনারা এমন চাপ দেন—'

সুব্রত বলল: 'ঠিকই তো বলেছেন।'

আরতি বলল: 'বল কি তুমি! ঠিক বলেছেন ?'

সুব্রত বলল: 'আঃ যেতে দাও। অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। উপরি পরে হবে। আগে নিচের মূলটুকু ঠিক রাখ। যা সময় পড়েছে, দেখছ তো দুটো ব্যাঙ্কে চানস্ পেতে পেতেও পেলাম না, হার্ড ডেজ। ভাবছি ওই পঞ্চাশ টাকার পার্টটাইমটাই আপাততঃ ধরি। বসে থাকবার কোন মানে হয় না। ইয়ে—তোমার সঙ্গে কোন হিচ্ হয়নি তো ?'

আরতি স্বামীকে আশ্বস্ত করে বলল: 'আরে নাঃ, আমি কিছু বলিনি। এডিথের সঙ্গেই যা একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। তবে আমার ভালো লাগছিল না।'

সুব্রত বলল: 'আরে ভালো তো লাগেই না। সময় বুঝে লাগাতে হয়।

দাঁড়াও, একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করতে দাও আমাকে—তারপর সব দেখে নেওয়া যাবে। সবুর কর ক'টা দিন।'

কিন্তু ক'টা দিন সবুর বুঝি আর আরতির সইল না। সুব্রত একটা চাকরির ইন্টারভিউর জন্য বর্ধমান গিয়েছিল। পরে বুঝেছে, লোক দেখানো বিজ্ঞাপন, নিজেদের লোক আগেই ঠিক হয়ে আছে। জোর সুপারিশ নিয়ে গিয়েছিল সুব্রত, তবু সুবিধা হয়নি। বেলা দশটায় বাসায় ফিরে এসে দেখল, আরতি দিব্যি সংসারের কাজ করছে, অফিসে যাওয়ার নাম নেই!

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল: 'ব্যাপার কি তোমার আজ ছুটি নাকি?'

আরতি স্বামীর চোখের দিকে না তাকিয়ে মুখ নীচু করে জবাব দিল: 'হুঁ।'

ভারি বিষণ্ণ আর ম্লান মুখ আরতির, কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে ভিতরে ভিতরে। চোখ দেখে মনে হয় সারা রাত ঘুমোয়নি।

সুব্রত বলল: 'কিসের ছুটি?'

'পরে বলছি।'

'পরে নয়, এখনই বল।'

নিজের ঘরের ভিতরে স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে গেল সুব্রত: 'ব্যাপার কি—'

আরতি ফিস ফিস করে বলল: 'আস্তে। আমি বাবা-মাকে জানাইনি। ছুটি নয়, চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

সুব্রত মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বলল: 'ছেড়ে দিয়েছ! কেন?'

আরতি বলল: 'মান-সম্মান নিয়ে ওখানে আর কাজ করা যায় না।'

এবার কঠিন দেখাল সুব্রতের মুখ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: 'হিমাংশুবাবু তোমাকে অসম্ভ্রমকর খারাপ কিছু বলেছেন? I shall teach him a lesson. ভেবেছে কি সে?'

আরতি স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হাসল: 'না, সে সব কিছু না।'

সুব্রত একটু শান্ত একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল: 'তবে কি?'

আরতি বলল: 'এডিথকে হিমাংশুবাবু অপমান করেছেন।'

'ও এডিথকে! তাতে তোমার কি? কি বলেছেন তিনি এডিথকে?'

আরতি সংক্ষেপে বলল ঘটনাটা।

কমিশন-টমিশন নিয়ে এডিথের সঙ্গে হিমাংশুবাবুর একটু খিটিমিটি হয়ে যাওয়ার পর, তিনি অফিসের রেগুলারিটি সম্বন্ধে আরো একটু সতর্ক হয়েছেন। কোন কাষ্টমারের বাড়ি থেকে ফিরতে একটু দেরি হলে কড়া কৈফিয়ৎ তলব করেন, আর কাউকে তেমন নয় এডিথের ওপরই তাঁর আক্রোশটা বেশি, ফিরতে একটু দেরি হলে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, 'কোত্থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরলেন?'

আরতি এতদিন কোন কথা বলেনি। যা জবাব দেওয়ার এডিথই দিয়েছে।

কিন্তু কাল এডিথ ছিল না। অসুস্থতার কথা আগেই ফোন ক'রে জানিয়েছিল। চিঠিও দিয়েছিল একটা। এদিকে রিপন ষ্ট্রীটে একটি মাদ্রাজী ক্রিশ্চিয়ানের বাড়ীতে সেদিনই মেশিনটা ডিমনষ্ট্রেট্ করতে নিয়ে যাওয়া দরকার। হিমাংশু এডিথকে না দেখে আগুন হয়ে গেল।

'সিমনস্ কোথায়?'

আরতি বলল: 'সে আসেনি। অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অফিসের দারোয়ানের সঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছে।'

চিঠিটি দেখাতে গিয়েছিল আরতি।

হিমাংশু অধীর হয়ে বলেছিল: 'থাক্ থাক্ চিঠি দিয়ে আমি কি করব? অসুস্থ! অসুস্থ না ঘোড়ার ডিম! ইচ্ছা ক'রে আমাকে জব্দ করবার জন্য কামাই করেছে। সে জানে আজ তাকে না হলে আমার কাজের ক্ষতি হবে, তাই—'

আরতি শান্তভাবে বলেছিল: 'তা হয়ত নয়; দারোয়ান তাকে বিছানায় শোয়া অবস্থায় দেখে এসেছে।'

হিমাংশু একটু চুপ করে থেকে বলেছিল : 'তা শুয়ে থাকবে না করবে কি ? কাল রবিবার গেছে। উপ্‌রি রোজগারের লোভে গেষ্টদের এণ্টারটেন করে আজ আর উঠতে পারবে কেন ?'

রমা আর মল্লিকা দু'জনেই ছিল রুমের মধ্যে। তারা আরক্ত হয়ে মুখ নীচু করে রইল। পূর্ব প্রান্তের একজন যুবক কেরাণী পশ্চিমের আর একজন প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

হিমাংশু চলে যাচ্ছিল, কিন্তু আরতি তীরের মত চেয়ার ছেড়ে সোজা উঠে দাঁড়াল : 'আপনি এডিথের নামে অমন যা তা বলতে পারবেন না।'

হিমাংশু বলল : 'সরি, আপনাদের সামনে কথাটা বলা হয়ত ঠিক হয়নি। কিন্তু যা বলেছি তা ঠিকই। ওরা ও-ই।'

আরতি তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করেছিল : 'কক্ষণো না। এডিথের স্বামী আছে, সন্তান আছে—'

হিমাংশু একটু হেসেছিল : 'তা সব মেয়েরই থাকে। আপনি ওদের চেনেন না।'

আরতি তেমনি অসহিষ্ণু উদ্ধত ভঙ্গীতে বলেছিল : 'আমি খুবই চিনি। এডিথের সঙ্গে আমি আজ ছ' মাস ধরে কাজ করছি। আপনিই না জেনে শুনে তাকে ইনসাল্ট করেছেন। আপনি যা বলেছেন উইথড্র করা উচিত।'

হিমাংশু কিছুক্ষণ জলন্ত চোখে আরতির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল : 'বটে! আমি যা বলেছি তার একটা অক্ষরও উইথড্র করা উচিত নয়, উইথড্র আমি করব না। আমি আবার বলছি, সে অত্যন্ত খারাপ টাইপের লুজ মরাল্‌সের মেয়ে।'

আরতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল : 'আপনি যা বলেছেন উইথড্র না করলে কোন ভদ্রলোকের মেয়েছেলে আপনার এখানে কাজ করতে পারে না।'

'বেশ তো।' বলে চেম্বারে ফিরে গিয়েছিল হিমাংশু ; কিন্তু দশ মিনিটের

মধ্যে যখন রেজিগনেশন লেটার বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল আরতি তখন হিমাংশুই ফের উঠে এসেছিল : 'আপনি কি পাগল হলেন নাকি মিসেস মজুমদার ? কোথাকার একটা যা তা টাইপের মেয়ে, জাতে মেলে না, ধর্মে মেলে না, তার জন্য আপনি চাকরি ছাড়তে যাবেন কেন ? আপনাকে তো কিছু আর বলা হয়নি ?'

আরতি বলল : 'আমাদেরই বলা হয়েছে।'

হল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ফের ডেকেছিল হিমাংশু: 'শুনুন, শুনুন। পাগলামি করবেন না। আপনাদের বাড়ীর অবস্থা আমি জানি।'

আরতি ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'আপনি উইথড্র করছেন তা হ'লে ?'

হিমাংশু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গম্ভীর, কঠিন স্বরে বলেছিল : 'না'।

আরতি আর দাঁড়ায়নি।

সমস্ত বাড়ীটা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কেউ কোন সাড়া শব্দ করল না। কি একটা সাংঘাতিক অঘটন যে ঘটেছে, তা কারো বুঝতে বাকি নেই। নন্তু সন্তু ফিস ফিস করতে লাগল, 'বৌদির চাকরি গেছে।'

ছেলের কাছে প্রিয়গোপাল আর সরোজিনী সব শুনলেন। কিন্তু সব বুঝলেন না। সত্যিই তো কোথাকার না কোথাকার একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। ওরা তো ওই ধরণেরই হয়। কাজের গাফিলতির জন্য মনিব যদি চটে গিয়ে দু'চার কথা তার সম্বন্ধে বলেই থাকে তো কি হয়েছে ? দোষ দেখলে তাঁরা বলেন না তাঁদের ঝি চাকরকে ? যে গরু দুধ দেয় তার চাটও সয়। চাকরি করতে গেলে মনিবের মেজাজ বুঝে চলতে হয় বৈকি। তা ছাড়া আরতিকে তো হিমাংশু কিছু বলেনি। বলবে কেন, একই জেলার লোক, জাতে একই বামুন, বলতে গেলে আত্মীয়ের মত।

প্রিয়গোপাল অবশ্য কোন কথাই বললেন না। খলের মধ্যে ডালিমের

রসের সঙ্গে স্বর্ণসিন্দুর মেড়ে জিভ দিয়ে চেটে চেটে খেতে লাগলেন। সংসারের কোন কথার মধ্যে তিনি আর নেই।

সরোজিনী বঁটিতে কুটনো কুটতে কুটতে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'আর এই কি আমাদের মেজাজ দেখাবার গোঁয়ার্তুমি করবার সময়? এমন চাকরি নেওয়াই বা কেন, আর ছাড়াই বা কেন? কিছু বুঝিনে বাপু।'

সুব্রত কাছেই চুপ করে বসেছিল, মার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল: 'সবচেয়ে মজার কথা মা, সত্যি সত্যি যাকে অপমান করেছে সে দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অফিসে হাজির হয়ে এতক্ষণে কাজও সুরু করে দিয়েছে। সে তো আর সেন্টিমেন্টাল বাঙ্গালী মেয়ে নয়।'

'তুমি, তুমিও তাই বলছ?'

আরতি চোখ তুলে তাকাল স্বামীর দিকে।

সুব্রত দেখল এতক্ষণে, এতদিন বাদে আরতির আয়ত সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে!

জৈব

'…সুতরাং হেরেডিটি বা বংশানুক্রমণ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে প্রচলিত ধারণা আছে তার ভিত্তি এবং সত্যতা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। প্রকৃত পক্ষে পিতামাতা এবং উর্ধতন পিতৃকুল মাতৃকুলের শারীরিক গঠন-বিন্যাস থেকে সুরু করে মানসিক গুণাগুণ, বৃত্তি-প্রবৃত্তির কতখানি অংশ বংশানুক্রমের সূত্রে উত্তরপুরুষে এসে পৌছতে পারে, আবার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব—মানে প্রাকৃতিক আবহাওয়া, পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যই বা সেই বংশানুক্রম ও মানুষের জীবনযাত্রাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে…'

রেডিওর সুইচটা অফ্ করে দিতে দিতে করবী বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'নাঃ ফের সেই বক্তৃতা সুরু হোল। এতরাত্রে কোথায় দু' একটা ভালো গান-টান দেবে প্রোগ্রামে, তা নয়—'

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আমার ডাক্তার বন্ধু বাসব মুখুয্যে চুপচাপ সিগারেট টানছিল করবীর দিকে চেয়ে, হঠাৎ বলে উঠল, 'আহাহা বন্ধ করে দিলেন নাকি ?'

করবী বলল, 'বন্ধ করব না কি করব, যে সে লোকের যত সব বাজে বক্তৃতা শুনবেন নাকি বসে বসে ?'

বাসব বলল, 'বক্তৃতা বাজে কিনা তা অবশ্য সঠিক বলা যায় না। কিন্তু লোকটি একেবারে যে সে নয়, ইউনিভার্সিটির স্কলার, এখানকার এক কলেজের প্রফেসর—'

করবী এবার বেশ একটু ঘাবড়ে গেল, কিন্তু মুখের জেদ ছাড়ল না ; বলল, 'তা হোলই বা স্কলার। আর প্রফেসর হলেই যে—'

বাসব বলল, 'কেবল তাই নয়, মৃগাঙ্ক মজুমদারের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়ও আছে।'

করবী বলল, 'ও তাই বলুন, সেই জন্তই বুঝি অমন মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছিলেন, সত্যি ফোনে রেডিওতে আত্মীয়-স্বজন, চেনা-শোনা বন্ধু-বান্ধবের গলা আমারও ভারি ভালো লাগে শুনতে।'

রেডিওটা আবার খুলতে যাচ্ছিল করবী, বাসব বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি, আবার খুলছেন নাকি? না না, থাক্ থাক্।'

এবার আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কেন। এই না বললে তোমার কোন প্রফেসর বন্ধুর বক্তৃতা!'

বাসব বলল, 'তাই বলে সেই বক্তৃতা যে আগাগোড়া শুনতেই হবে এমন কথা বলিনি। তাছাড়া রেডিওতে বন্ধু-বান্ধবের গলা আমার ভালো লাগে না, আমার কান তো আর তোমার স্ত্রীর কানের মত নয়।'

হেসে বললুম, 'তা তো নয়ই। তুমি বড়জোর চামড়ার স্টেথোস্কোপ কানে গুঁজতে পারো, কিন্তু আমার স্ত্রীর মত এমন রত্নখচিত কান তুমি কোথায় পাবে!'

বাসবও হাসল, 'সে কথা সত্যি।'

করবী বলল, 'তাহলে শুনবেন না আপনার বন্ধুর বক্তৃতা?'

বাসব মাথা নাড়ল, 'না থাক, মৃগাঙ্ক বাবুর এসব টক্ আমার ভারি খারাপ লাগে। ওঁর বোঝা উচিত সুনন্দা এতে কত কষ্ট পান, অশান্তি ভোগ করেন। তাঁর মনের ওপর এগুলির প্রতিক্রিয়া—'

শুধু গলায় নয়, চোখেমুখেও কৌতূহল ঝলকে উঠল করবীর, 'সুনন্দা কে?'

বাসবের মুখ দেখে মনে হোল কথাগুলি ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে সে লজ্জিত হয়ে পড়েছে।

একটু গম্ভীর হয়ে বাসব বলল, 'সুনন্দা মৃগাঙ্ক বাবুর স্ত্রী।'

করবী বলল, 'তা হ'লে স্বামীর বক্তৃতা শুনতে তাঁর কষ্ট হবে কেন, কি যে বলেন।'

প্রসঙ্গটা একটু হালকা করবার চেষ্টায় আমি বললুম, 'তা ঠিক। মাথা

মুণ্ড না থাকলেও স্বামীর বক্তৃতা আর তাল মান না থাকলেও স্ত্রীর গান পরস্পরের কানে বোধ হয় সব চেয়ে সুখশ্রাব্য।'

আমার এমন রসিকতাটা মাঠে মারা গেল, কারণ বাসব তেমনি গম্ভীর হয়ে রইল। করবীও আমার কথায় কোন রকম কান না দিয়ে বাসবের দিকে চেয়ে বলল, 'বিষয়টা কি বাসব বাবু? অবশ্য খুব গোপনীয় হলে—'

বাসব একটু হেসে বলল, 'খুবই গোপনীয়। তবু না হয় খানিকটা কৌতূহল আপনার মেটাতে পারতুম কিন্তু ব্যাপারটা আপনার কাছে বলাও মুসকিল।'

করবী বলল, 'কিচ্ছু মুসকিল হবে না। আমার নার্ভ আপনাদের কারো চেয়ে কম শক্ত নয়।'

বাসব একটু হাসল, 'মেয়েরা প্রথম প্রথম ওই রকমই ভাবে, ওই রকমই বলে, কিন্তু শেষে দেখা যায়—'

করবী অধীর হয়ে বলল, 'শেষে যা দেখা যায় তা আমরা না হয় শেষেই দেখব। কিন্তু বলতেই যদি চান গোড়া থেকেই বলুন দয়া করে।'

ছাই-দানিতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বাসব, তারপর বলল, 'আচ্ছা, তাহলে শুনুন। তবে গোড়া থেকে নয়, মাঝখান থেকে। কেননা গোড়ার ব্যাপারটা আমিও তেমন জানিনা।'

দাঙ্গার সময়কার ঘটনা। ডিস্‌পেন্‌সারীতে সেদিন তেমন ভিড় নেই। কারণ আমার বেশীর ভাগ রোগীই মুসলমান, দাঙ্গাহাঙ্গামার জের তখনও চলতে থাকায় হিন্দুপাড়ায় তারাও আসতে পারে না, আমারও ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু চাল ডাল তেলনুনের প্রয়োজন তো আর দাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করে না। আর তার জন্য টাকারও দরকার হয়। মন মেজাজ ভারি খারাপ। অন্য সময় রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বেশ ভিড় থাকে রোগীর। সেদিন আটটা বাজতে না বাজতেই ডিসপেনসারী খালি হয়ে গেল। পাড়ার দু' চার জন রোগী যা ছিল প্রায়ই খাতিরের। তাদের বিদায় দিয়ে উঠি উঠি করছি। ডিসপেনসারীর সামনে সশব্দে হঠাৎ এক খানা

ট্যাক্সী এসে থামল। রোগীর সাড়া পেয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে সোজা হয়ে বসলুম, নিমেষের মধ্যে টেবিলটাকেও গুছিয়ে নিলাম একটু। ততক্ষণে ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

মুখের দিকে তাকিয়ে চেনা চেনা মনে হোল, একটু ইতস্তত করে বললুম, 'বসুন।'

সাতাশ আঠাশ বছরের স্বাস্থ্যবান সুদর্শন ভদ্রলোক সামনের চেয়ারে বসে বললেন, 'আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারলেন না। আমরা স্কটিশে বছর দুই একসঙ্গে পড়েছিলুম।'

বললুম, 'ও ঠিক ঠিক, এবার মনে পড়েছে, আপনার নাম বোধ হয়—'

'মৃগাঙ্ক মজুমদার।'

বললুম, 'অনেকদিন পরে দেখা হোল।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা হোল। দেখুন, আমি খুব একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছি।'

মৃগাঙ্কবাবুর দিকে একটু তাকিয়ে নিলুম। বেশ লম্বা-চওড়া সবল চেহারা। ফর্সা গায়ের রঙ। চওড়া কপাল। মাথার চুল ব্যাক্‌ব্রাস করা। অস্বাস্থ্যের তেমন কোন লক্ষণ চোখে পড়ল না। কিন্তু অসুখ তো আর সব সময় প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। এমন কি ডাক্তারের চোখেও নয়।

'বলুন।'

ভদ্রলোক একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা বিশেষ গোপনীয়।'

ডিসপেনসারীতে দ্বিতীয় জনপ্রাণী নেই। পার্টিশনের ওপাশে কম্পাউণ্ডার রমেশ ওষুধের আলমারীর সামনের টুলটায় ঢুলছে। চাকর হরিদাসও কাছাকাছি নেই। কোথাও বোধ হয় মোড়ের পান বিড়ির দোকানটায় গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

বললুম, 'তাহলেও এখানে বলতে পারেন। আর যদি কোন অসুবিধা বোধ করেন, তাহলে পাশের কেবিনে চলুন।'

একবার কেবিনের কাটা দরজার দিকে আর একবার বাইরে দাঁড়ানো ট্যাক্সীটার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমার স্ত্রী রয়েছেন গাড়িতে।'

একজন মহিলা যে গাড়িতে বসে আছেন তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু যেন এইমাত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তেমনি ভঙ্গিতে বললুম, 'সে কি, ওঁকে নিয়ে আসুন এখানে।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'দরকার হলে পরে আনব।'

বললুম, 'আচ্ছা তাহলে কি কেবিনের ভিতর যাবেন?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'দরকার নেই, এখানেই বলছি। She is in family way. But we don't want it. বুঝতে পারছেন?'

বললুম, 'বুঝেছি। কতদিন হোল?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'stageটা একটু advanced. চার মাস চলছে।'

বললুম, 'একটু মানে বেশ advanced. এখন কিছুই করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মনে কিছু করবেন না, এ সব কথা আপনারা ভাবছেনই বা কেন। আপনাদের আর কি কোন সন্তান আছে?'

'না।'

'তাহলে? তা ছাড়া এ সব ব্যাপারে আগে থেকে সাবধান হওয়াই ত ভাল।'

'Precaution আমরা নিতাম।'

'Fail করেছে বুঝি? কিন্তু দু' একটি সন্তানও হ'তে দেবেন না এই বা কোন্ কথা? আপনার স্ত্রীর বয়স কত?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তেইশ চব্বিশ।'

বললুম, 'এই বয়সে দুটি একটি সন্তান থাকাই তো ভালো।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা জানি কিন্তু আমার স্ত্রীকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না।'

একটু অবাক হয়ে থেকে বললুম, 'মাতৃত্বটা কেন যে মেয়েরা আজকাল

পছন্দ করেন না বুঝি না, ওঁকে যদি এখানে আনেন আমি বরং বুঝিয়ে বলতে পারি। তাছাড়া এখন তো কিছুই করা সম্ভব নয়। কোন বুদ্ধিমান লোকই এতে রাজী হবে না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'অন্যান্য ডাক্তাররাও সেই কথা বলেছেন। আচ্ছা আপনিই বরং সুদত্তাকে একটু বুঝিয়ে বলুন। দেখুন আমার মোটেই ইচ্ছে নয়। কতখানি বিপদের সম্ভাবনা তা খুবই বুঝতে পারছি। তবু ওকে নিয়ে বড় মুসকিলে পড়েছি।'

মৃগাঙ্কবাবু উঠে গিয়ে গাড়ী থেকে স্ত্রীকে নামিয়ে আনলেন। লম্বা দোহারা চেহারার ফর্সা সুন্দরী বধূ। বেশ স্বাস্থ্যবতী। এ অবস্থায়ও তেমন কোন অবসাদ কি ক্লান্তির ভাব নেই। অথচ কেন এসব অদ্ভুত খেয়াল এঁদের হচ্ছে আমি ভেবে পেলাম না।

বললুম, 'পাশের ঘরে চলুন।'

মহিলাটিকে বেশ একটু খুসি মনে হোল। যেন আশাপ্রদ খবর কিছু পেয়েছেন।

তিনজনেই ঢুকলুম কেবিনে। গদিআঁটা বেঞ্চটায় পাশাপাশি বসলুম।

আমি কিছু বলবার আগে ভদ্রমহিলাই কথা বললেন, 'আপনি তাহলে রাজী আছেন? আপনি পারবেন?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'কেউ পারবে না। এ সব অসম্ভব ব্যাপার আপনারা চিন্তা করছেন কেন বলুন তো?'

সুদত্তার মুখখানা একটু যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিন্তু পর মুহূর্তেই আরক্ত মুখে উত্তেজিত স্বরে তিনি বললেন, 'দেখুন, আপনার কাছে আমি হিতোপদেশ শুনতে আসিনি। এসব উপদেশ ডাক্তাররা আজ মাস দেড়েক ধরে আমাকে শোনাচ্ছেন। কোন পথ আছে কি না, তাই বলুন, যত টাকা লাগে—'

ভদ্রঘরের এমন একটি সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলার মুখে এসব কথা উচ্চারিত হতে শুনে আহত হয়ে বললুম, 'দেখুন, টাকার প্রশ্ন নয়, বৈধতার আগ্রহ যে হয় বাদ দিলুম। কিন্তু আপনার জীবনের যেখানে risk—' বললুম, 'তারপর?'

'জীবনের risk!' যেন অসহায় ভাবে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন সুদত্তা, 'আপনি তো জানেন না প্রতিমুহূর্তে পলে পলে আমি কি ভাবে দগ্ধ হয়ে মরছি! সব সময়ের জন্য গা ঘিন ঘিন করছে আমার, গা বমি বমি করছে। খেতে শুতে উঠতে বসতে কাঁটার মত বিঁধছে আমাকে। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না, কিছুতেই না। দয়া ক'রে আপনি আমাকে বাঁচান। অশুচিতার হাত থেকে রক্ষা করুন। চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব আপনার কাছে।'

আমি অবাক হয়ে মৃগাঙ্কবাবুর দিকে তাকালুম। তিনি স্ত্রীর আধা-হিষ্টেরিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে আছেন।

একটু পরে সুদত্তাই ফের কথা বললেন, 'ওঁকে বল, ওঁকে সব বুঝিয়ে বল। কোন কথা গোপন করবার দরকার নেই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'কিন্তু সব খুলে বললেই তো আর ডাক্তারী শাস্ত্র বদলে যাবে না সুদত্তা, খুলে তো এমন আরো দু'চার জনকে বলেছি।'

'ওঁকেও বল। উনি নিশ্চয়ই কিছু একটা পথ বলে দিতে পারবেন।'

মৃগাঙ্কবাবু আমার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে পাশের ঘরে আসতে বললেন। সুদত্তা বসে রইলেন কেবিনে।

আড়ালে বসে একটু ইতস্তত ক'রে মৃগাঙ্কবাবু সংক্ষেপে আমাকে বললেন, 'উত্তর ভারতে দাঙ্গার সময় আমার স্ত্রী লাহোরে ছিলেন।'

বললুম, 'আত্মীয়ের কাছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, সেইখানেই দুর্ঘটনা ঘটে। মাস তিনেক পরে একটি ছোট্ট স্টেট থেকে সুদত্তাকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। কিন্তু মনের স্বাভাবিক অবস্থা কিছুতেই ওর ফিরে আসছে না, কেবল ডাক্তারের বাড়ী দৌড়োদৌড়ি করাচ্ছে। অথচ আমি বেশ জানি এ অবস্থায় ডাক্তারদের কিছু করবার নেই, করা সঙ্গতও নয়।'

পারছি নাকি মাথা নেড়ে বললুম, 'না, ওঁকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে শান্ত রাখাই একটু অবাস উচিত।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা তো বটেই। আমি ওকে যথেষ্ট বুঝিয়েছি। একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি। We must wait for the proper time.'

বললুম, 'ওঁকে ওঁর বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দিন না কেন। সেখানে হয়তো খানিকটা শান্তিতে থাকবেন।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বাপ মা নেই। দূরসম্পর্কের কাকা কাকীমা আছেন। সেখানে জোর করে পাঠিয়েছিলাম। দু'দিন বাদেই ফিরে এসেছে। তাঁরাও তো সব শুনেছেন। এসব ঝক্কি পোহাতে তাঁরাও ভিতরে ভিতরে রাজী নন।'

মৃগাঙ্কবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'অকারণে আপনাকে বিরক্ত করলুম। আপনার ফীজ—'

বললুম, 'ছি ছি ছি আপনাদের জন্যে কিছু করতে পারলে খুব খুসি হতুম কিন্তু এ অবস্থায়—। পরে যদি কোন দরকার হয়—।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। দরকার তো হবেই, ওই সময় কোন হাসপাতাল-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হবে। আমার তেমন কোন জানাশোনা নেই—'

বললুম, 'সেজন্য কোন অসুবিধে হবে না। কারমাইকেলের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ আছে। সময়মত সেখানেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি ভাববেন না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ। একদিন আসুন না আমাদের ওখানে। বিডন স্ট্রীটে আমার বাসা। এলে খুব খুসি হব। সেই সব কলেজী দিনগুলিই ভালো ছিল মশাই।'

বললুম, 'সত্যি।'

বাসব একটু থেমে করবীর মুখের দিকে তাকাল। করবী একটি মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে। মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু শুনবার আগ্রহ যে তেমনি আছে সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ রইল না। বললুম, 'তারপর?'

বাসব আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'তারপর পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে বারকয়েক দেখা সাক্ষাৎ হোল মৃগাঙ্কবাবুদের সঙ্গে। যত আলাপ পরিচয় হতে লাগল, মৃগাঙ্কবাবুর ওপর আমার তত শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল। সত্যি বলতে কি, কলেজের ভালো ছেলেদের সম্বন্ধে আমার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। ফার্স্ট বেঞ্চ আর ফার্স্ট-ক্লাস ওয়ালারা জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ, এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুকে দেখে সে ধারণা পালটাতে সুরু করল। ওঁর নিজের সাবজেক্ট কেমিস্ট্রি। কিন্তু রসায়নেই ওর রসের পিপাসা সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও বেশ ঔৎসুক্য আছে। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেও উৎসাহের অভাব নেই। কিন্তু আমাকে যা আকর্ষণ করল তা ওর পাণ্ডিত্য নয়, মৃগাঙ্কবাবুর অমায়িক ব্যবহার, সৌজন্য, শিষ্টাচারেই আমি বেশি মুগ্ধ হলাম। বিশেষত স্ত্রী সম্বন্ধে যে দুর্ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে তাকে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে নিতে পেরেছেন দেখে আরো ভালো লাগল। যতই বলি আমি নিজে হোলে এমন হয়-ত পারতাম না।

'কথায় কথায় মৃগাঙ্কবাবু একদিন বললেন, "সেদিন রাত্রের ব্যবহারে আপনি আশ্চর্য হয়েছিলেন বোধ হয়। আমি জানি ওসব হবার নয়, বিন্দুমাত্র রিস্ক আমি নিতে চাইনে। কিন্তু কি করব বলুন, সুদত্তাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারলুম না, ওকে দেখাবার জন্যই—"

'বললুম, "তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। না হলে আপনার মত লোক অমন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব—"

'আরো এ্যাডভানসড্ স্টেজে পৌঁছে সুদত্তাও ওসব চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হলেন। তিনিও বুঝতে পারলেন শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়, কেউ তাঁকে কোন রকম সাহায্য করবেনা, করতে পারবেনা।

'কিন্তু বাইরে নিশ্চেষ্ট রইলেন বটে ভিতরে ভিতরে কথাটা প্রায়ই তাঁর মনে খোঁচা দিতে লাগল। একদিন গভীর অভিমানে বললেন, "আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের ওপর আমার আর কিছু মাত্র বিশ্বাস নেই।"

'আমি চুপ ক'রে রইলুম। ডাক্তারী শাস্ত্রের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করতে মন সরল না। কারণ এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর স্ত্রী যে কত কষ্ট পাচ্ছেন তা মৃগাঙ্কবাবু আমাকে সবই প্রায় খুলে বলেছিলেন। সব সময় একটা অশুচি অপবিত্রতার ভাব সুদত্তা মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। এমনকি স্বামীর গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যেও সুদত্তা শিউরে উঠতেন, কিংবা আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। স্ত্রীর ভাবভঙ্গি দেখে মৃগাঙ্কবাবুরও যে মাঝে মাঝে আড়ষ্টতা না আসত তা নয়, কিন্তু অসীম তাঁর ধৈর্য, অদ্ভুত তাঁর বৈজ্ঞানিক সহিষ্ণুতা। স্ত্রীর স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য মৃগাঙ্ক বাবুরও চেষ্টার অন্ত ছিল না। এর আগে সিনেমা থিয়েটার মৃগাঙ্কবাবু পছন্দ করতেন না। নিজের কাজ কর্মের পক্ষে অনিষ্টকর বলে মনে করতেন ওগুলিকে। অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে সুদত্তা দেখতে যেতেন সিনেমা থিয়েটার। কিন্তু এই ব্যাপারের পর মৃগাঙ্কবাবু নিজে হলেন তাঁর সঙ্গী। সুদত্তা অবশ্য বেশি বাইরে যেতে চাইতেন না। সারা দিন রাত ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চাইতেন। কিন্তু আমিই পরামর্শ দিয়েছিলাম, ওঁকে একা থাকতে দেওয়া ঠিক নয়। বরং এ সময় একটু হাঁটা-চলা করা ভালো, যাতে আলো হাওয়া গায়ে লাগে আর মনটা প্রফুল্ল থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

'এসব উপদেশ অবশ্য সুদত্তা মোটেই কানে তুলতেন না। বরং এই অবস্থায় শরীরের পক্ষে যত রকম অনিয়ম অত্যাচার করা সম্ভব সবই তিনি করতেন। সময় মত নাইতেন না, খেতেন না, নানাভাবে নিজের শরীরকে নিপীড়ন করতেন। আমরা বুঝতে পারতুম এই নিপীড়নের মূল লক্ষ্য কি।

'একদিন সুদত্তা বললেন, "বাসববাবু, এমন কিছু করা যায় না, ভিতরের জিনিসটা যাতে আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায়? আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনে।"

'আমি বুঝতে পারতুম এই সব কথা বলবার জন্যই, এই সব আলোচনার জন্যই সুদত্তা আমাকে তাঁদের বাসায় মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন। মৃগাঙ্ক

বাবুও চাইতেন আমি তাঁদের ওখানে যাই। সুদত্তা এসব কথা আলোচনা করুন আমার সঙ্গে। কারণ এভাবে সুদত্তার মনের ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, ওই ধরণের চিন্তা প্রকাশের পথ পাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদত্তাও খানিকটা তৃপ্তি আর স্বস্তি বোধ করবেন।

'একদিন এক কাণ্ড ঘটল। মৃগাঙ্কবাবুর মুখেই শুনেছিলাম ঘটনাটা। তাঁর দূর সম্পর্কের এক পিসীমা থাকতেন কাশীতে। চোখের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসে মৃগাঙ্কবাবুদের বাসায় রইলেন কিছুদিন। আমিই তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। দুই চোখেই ক্যাটার‍্যাক্ট। অপারেশন করাতে হবে। মৃগাঙ্কবাবুর পিসীমা কেবল যে চোখেই কম দেখেন তা নয়, কানেও কম শোনেন। এসব দাঙ্গাহাঙ্গামা আর মৃগাঙ্কবাবুদের ভাগ্য বিপর্যয়ের খবর তাঁর কানে যায়নি।

'কিন্তু চোখে যতই কম দেখুন, সুদত্তার সন্তান সম্ভাবনাটা তাঁর দৃষ্টি এড়ালনা।

'ক'মাস হোল? বউয়ের সাধটাধ দিয়েছিস?'

মৃগাঙ্কবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'ওসব আমরা মানিনে পিসীমা?'

পিসীমা বললেন, 'তা মানবি কেন। যত সব ম্লেচ্ছ খৃষ্টানের দল। সাধ না দিলে কি হয় জানিস? ছেলে 'ছোঁচা' হবে। সব সময় লালা বেরুবে মুখ দিয়ে। কোলে নিতে পারবি নে, জামা কাপড় সব নষ্ট হয়ে যাবে। ভালোয় ভালোয় সাধ দে। বউয়ের যা খেতে ইচ্ছা করে এনে এনে খাওয়া। এ খাওয়ানো কেবল পরের মেয়েকে নয়। যে আপন জন পেটের মধ্যে আস্তানা গেড়েছে, মায়ের মুখ দিয়ে সে-ই এসব ভালো অভালোর স্বাদ নেবে। তা যেমন বাপের ঘরে জন্মেছিস তেমনি তো হবি? যেমন আমার দাদার হাত দিয়ে জল গলে না, তেমনি হয়েছিস তুই, কৃপণের শিরোমণি।'

মৃগাঙ্কবাবুর বাবা কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন। এদিকে অবস্থা একটু শান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাড়ীতে গেছেন। জমি জমা বিষয় সম্পত্তি সব সেইখানে। নিজেকেই দেখতে হয়।

দাদার পরিবর্তে তাঁর বোন মৃগাঙ্কবাবুর পিসীমাই বউয়ের সাধের বন্দোবস্ত করলেন, ভাইপোকে ধমকে ফরমায়েস ক'রে ক'রে আনালেন সব জিনিসপত্র। নিজের হাতে রাঁধলেন মিষ্টান্ন, তৈরী করলেন পিঠে পায়েস। আনালেন নতুন শাড়ি। তারপর সব সাজিয়ে ধরলেন বউয়ের সামনে।

সুদত্তা পিসী শাশুড়ীর অলক্ষ্যে সব নর্দমায় ফেলে দিলেন। স্বামীকে ডেকে বললেন, 'পিসীমাই না হয় কিছু জানেন না, কিন্তু তুমি জেনে শুনে আমাকে এমন ক'রে অপমান করছ কেন?'

তারপর বালিশে মুখ চেপে এই কান্না। সুদত্তা নান না, খান না, বেরোন না ঘর থেকে।

অপারেশন শেষ হলেও মৃগাঙ্কবাবুর পিসীমা প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে রইলেন। যাওয়ার সময় বললেন, 'যদি দরকার হয় বল। এ সময় একজন কারো বউয়ের কাছে থাকা উচিত। যদি বলিস আমি থেকে যাই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'না পিসীমা, তোমাকে আর আটকে রাখতে চাইনে, তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি নার্স রেখে দেব।'

পিসীমা একটু দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ভালোয় ভালোয় সব হয়ে গেলে একটা খবর দিস। ছেলে না মেয়ে জানাস কিন্তু একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে। আহা, বাবা বিশ্বনাথ করুন ছেলেই যেন হয় তোর ঘরে। পাকা ডালা দেব বাবার মন্দিরে। নাম রাখব বিশ্বেশ্বর।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার গাড়ির সময় হোল, গুছিয়ে নাও তাড়াতাড়ি।'

মৃগাঙ্কবাবুদের বাড়ির একতলায় আর এক ঘর ভাড়াটে থাকে। স্বামী, স্ত্রী আর শাশুড়ী। বউটি নিঃসন্তান। অনেক ডাক্তার কবরেজ দেখান হয়েছে, কালী মন্দিরে তারকেশ্বরে মানত রয়েছে বহু। হাতে তাবিজ, গলায় মাদুলী। বউটি মাঝে মাঝে সুদত্তাকে বলে, 'দিদি, একি মেমসাহেবী ঢং আপনাদের। সাত রাজার ধন মানিক আসছে ঘরে। কোন রকম

সাড়া শব্দই নেই। শীত এলো। জামা আর মোজা কিছু ক'রে টরে রাখুন। নইলে শেষে কিন্তু ভারি অসুবিধে হবে।'

সুদত্তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ক'রে বলেন, 'ওসব কিছু দরকার হয় না আমাদের।'

বউটি বলে, 'হয় আবার না। দিদি, নিজের পেটেই না হয় কিছু হয়নি। তাই বলে দেখিনি শুনিনি এমন তো নয়। আমার তিন বোনের তেরটি ছেলে মেয়ে। কাঁথা টাঁথা না ক'রে রাখলে ভারি কষ্ট হয় শেষে। আচ্ছা, আপনার নিজের যদি আলস্য লাগে, আমাকে আনিয়ে দিন উল টুল আমি সব ক'রে দেব, কিচ্ছু ভাবনা নেই আপনাদের। লোকে চেয়ে পায় না, আর আপনারা—'

এত সব কথার পরেও সুদত্তা জিনিসপত্র আনিয়ে দিলেন না দেখে বউটি নিজের স্বামীকে দিয়ে উল আনিয়ে টুপী আর মোজা বুনতে সুরু করল।

সুদত্তা স্বামীকে বললেন, 'আর তো পারিনে। তার চেয়ে ওদের সব খুলে বল। জগৎ শুদ্ধু লোককে জানিয়ে দাও—উঃ, জঘন্য, জঘন্য, আমি আর সহ্য করতে পারব না—'

কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু সহ্য করতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে কখনো তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখিনি।

তারপর শেষ পর্যন্ত সুদত্তার সময় এল। কারমাইকেলে আমি কিছুদিন হাউস সার্জন ছিলাম জানো বোধ হয়। গেলে এখনো সবাই খাতির যত্ন করে। কোন রকম অসুবিধাই হোল না। আলাদা একটা কেবিন নেওয়া হোল সুদত্তার জন্য। দু'জন নার্স রাখা হোল। ওয়ার্ডের ডাক্তার বোসকে আমি বিশেষ ভাবে বলে দিলুম খোঁজ খবর নিতে। তবু মৃগাঙ্কবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন, 'আপনার পক্ষে যদি থাকা সম্ভব হয়, খুব উপকৃত হব—'

হেসে বললুম, 'তার দরকার হবে না। তবু আমি সাধ্যমত খোঁজ খবর নেব। ডেলিভারির পরই যাতে আমাকে ফোনে জানানো হয় তারও ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি।'

স্বামীর উদ্বেগ দেখে সুদত্তাও একটু হাসলেন, 'অত ভাবছ কেন তুমি, কিছু ভয় নেই—'

সুদত্তার মুখের এই হাসিটুকু ভারি ভালো লাগল। বেশ লাগল তাঁর স্বামীকে আশ্বাস দেওয়ার ধরণটুকু। মনে হোল তিনি নিজেও আশ্বস্ত হতে পারছেন। উদ্বেগ অশান্তি অস্বস্তির হাত থেকে এবার মুক্তি। আগেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত ক'রে রাখা হয়েছে। ডেলিভারির পর সন্তানটিকে নার্স অন্য ঘরে সরিয়ে নেবে. তারপর মেথর টেথর কেউ যদি নেয় দিয়ে দেওয়া হবে তাকে, আর না হয় কোন আশ্রম টাশ্রমে। সে সব ব্যবস্থা ওরাই করবে। সেজন্য মৃগাঙ্কবাবুকে কিছু ভাবতে হবে না। এমন কেস্ মাঝে মাঝে আসে এখানে। কি করতে হয় না হয় নার্সরাই সব জানে। ওদের হাতে টাকা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়। সে টাকা জলে যায় না।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'কিন্তু যাই বলুন, আমার কিছু ভাল লাগছে না বাসব বাবু। জীবনে সজ্ঞানে কোনদিন কোন মিথ্যার আশ্রয় নিইনি। আর এসব নোংরামির মধ্যে আমাকেই কিনা জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।'

বললুম, 'উপায় কি বলুন।'

সুদত্তা দৃঢ়স্বরে বললেন, 'ওঁর কথায় কান দেবেন না। যা ব্যবস্থা হয়েছে তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।'

হাসপাতাল থেকে নার্স আমাকে রিং করল সকালে। শেষ রাত্রে ছেলে হয়েছে সুদত্তার। বিশেষ কোন কষ্ট পান নি মিসেস মজুমদার। সন্তানটিও ভালোই আছে। বেশ স্বাস্থ্যবান সন্তানই হয়েছে।

খবরটির প্রথমাংশ ফোনে জানিয়ে দিলুম মৃগাঙ্কবাবুকে।

তিনি বললেন, 'চলুন একবার দেখে আসি সুদত্তাকে।'

একটু বিরক্ত হলুম মনে মনে। আবার আমাকে কেন টানাটানি করছেন। বললুম, 'আমার তো বেলা একটার আগে অবসর হবে না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বেশ একটাতেই যাব।'

তারপর আমরা দুজনে মিলে উপস্থিত হলুম হাসপাতালে। পর্দা ঠেলে নার্সের সঙ্গে ঢুকলুম গিয়ে মিসেস মজুমদারের কেবিনে। ঢুকেই দুজনে দোরের কাছে একটু থমকে দাঁড়ালুম। একটি নার্স সুদত্তার বেডের কাছে দামী একটি তোয়ালেতে জড়িয়ে শিশুটিকে দু'হাতে মেলে ধরে টুলের ওপর বসেছে। আর সুদত্তা অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন সন্তানকে। তাঁর চোখে ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই, অস্বস্তি অশান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। গভীর শান্তি আর পরিতৃপ্তিতে সুদত্তার মুখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সুন্দর আর প্রশান্ত।

কিন্তু আমাদের দেখে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন সুদত্তা। ফ্যাকাশে ক্লান্ত মুখখানিতে যেন দেহের সমস্ত রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই নার্সকে ধমকে উঠলেন, 'যান, যান, নিয়ে যান এখান থেকে। ওকে কে আনতে বলল আপনাকে।'

নার্সটি মুহূর্তের জন্য বুঝি একটু হতভম্ব হয়ে রইল তারপর মুচকে একটু হেসে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি সুদত্তার দিকেই তাকিয়েছিলুম। মৃগাঙ্কবাবুর মুখভাবের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করবার সুযোগ পাই নি। যখন তাঁর দিকে তাকালুম কোন বিকৃতির ভাব দেখতে পেলুমনা।

একটু বাদে স্ত্রীকে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ সুদত্তা!'

প্রকৃতিস্থ হতে একটু সময় লাগল মিসেস মজুমদারের, চোখ নিচু ক'রে বললেন, 'ভালো।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমার এত ভয় হচ্ছিল।'

সুদত্তা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ভয়ের কি আছে।'

মৃগাঙ্কবাবু একটু যেন হাসলেন, 'না এবার নিশ্চিন্ত।'

খানিক বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম আমরা। হঠাৎ মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বাসববাবু, আগের এ্যারেন্‌জমেণ্ট সব ক্যান্‌সেল করুন। আমি বাড়ি নিয়ে যাব।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'সে কি। তা কি ক'রে হবে। মিসেস

মজুমদারই বা তাতে রাজী হবেন কেন। না না না, ও সব করতে যাবেন না মৃগাঙ্কবাবু, জটিলতা বাড়াবেন না।'

মৃগাঙ্কবাবু সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে হাসলেন, 'জটিলতার তো কিছু নেই। মাতৃত্ব সব চেয়ে সহজ, সব চেয়ে প্রাঞ্জল।'

আমি প্রতিবাদ ক'রে বললুম, 'না না না, কি বলছেন আপনি। এখানকার মাতৃত্ব তো অবিমিশ্র নয়। তার সঙ্গে সমাজ, সম্মান, কত রকম কত সংস্কার সুবিধা অসুবিধা-বোধ জড়িয়ে আছে। মিসেস মজুমদারের যে বাৎসল্য আপনি দেখলেন, তা হয় তো নিতান্তই ক্ষণিক, নিতান্তই ফিজিক্যাল।'

মৃগাঙ্কবাবু একটু হাসলেন, 'সবই তো তাই।'

আমার বাধা মানলেন না মৃগাঙ্কবাবু। তখনই নার্সদের সঙ্গে আগের বন্দোবস্ত সব নাকচ ক'রে দিয়ে এলেন।

আমি বললুম, 'কিন্তু মিসেস মজুমদার—'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমি সব ম্যানেজ ক'রে নেব। আপনি ভাববেন না।'

বেশ একটু বিরক্তির সুর মৃগাঙ্কবাবুর গলায়। মনে মনে ভাবলুম, 'আমার ভাববার কি আছে।'

সপ্তাহখানেক বাদে স্ত্রীপুত্রকে বাড়ি নিয়ে গেলেন মৃগাঙ্কবাবু। শুনলুম সুদত্তা খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু কান দেন নি। বলেছিলেন, 'আচ্ছা পাগল তো তুমি। না হয় তোমার মত সুন্দর হয় নি, একটু কালোই হয়েছে, তাই বলে ছেলে কেউ ফেলে দিয়ে যায় নাকি।'

বাড়িতে পৌঁছে ফোনে আমাকে খবর দিলেন মৃগাঙ্কবাবু, 'সব ঠিক হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে যথেষ্ট কষ্ট দিলুম আপনাকে—'

আমি বললুম, 'না না না।'

সেই সময় মজুর শ্রেণীর একটি রোগী আমার ডিসপেনসারীতে বসেছিল। সঙ্গে স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটিই বড়। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যই

এসেছে। দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে দিলুম। ছোট ছেলেটি মার কোলে উঠেছে দেখে বড়টিও কোলে উঠবার দাবী জানাতে লাগল। স্বামী তাকে নিজে তুলে নিল কোলে।

বললুম, 'ছেলে বুঝি তোমার খুব বাধ্য ?'

ও জবাব দিল, 'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। ভারি ন্যাওটা।'

মনে মনে হাসলুম। ছেলেটি ওর স্ত্রীর আগের পক্ষের। ও আমার অনেক দিনের পেশেণ্ট। ওদের সব খবরই জানি। ওর আগের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বর্তমান স্ত্রীকে সে বিয়ে করে এনেছে। তখন বিধবা মেয়েটির কোলে ছিল এই ছেলেটি। আজ সে তার মার কোল ছেড়ে দিব্যি আমার রোগীর কোলে চড়ে বসেছে। সবই অভ্যাস, সবই সংস্কার। যেমন মনের জোর দেখেছি মৃগাঙ্কবাবুর তাতে তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

তারপর বছর খানেকের মধ্যে কোন খোঁজ খবর রাখিনি মৃগাঙ্কবাবুর। ওঁরাও খোঁজ নেন নি। আমিও ইচ্ছা ক'রে দূরে সরে রয়েছি। আমার সঙ্গ খুব প্রীতিকর আর বাঞ্ছনীয় নাও হতে পারে ওঁদের পক্ষে।

কিন্তু মাসখানেক আগে মিসেস মজুমদার হঠাৎ সেদিন আমাকে ফোনে ডেকে বললেন, তিনি অসুস্থ। দয়া ক'রে আমি যদি যাই তিনি খুব উপকৃত হবেন।

আমি বললুম, 'আচ্ছা। কিন্তু মিষ্টার মজুমদার কোথায় ?'

'তিনি একটু বাইরে গেছেন।'

হরিপাল লেনে আর একটা কল ছিল। শেষ করতে করতে বেলা দেড়টা, তারপর হাজির হলাম মৃগাঙ্কবাবুর বাড়ি।

পুরোন চাকর অমূল্য আমাকে গত বছর থেকেই চেনে; দেখে হেসে বলল, 'আসুন ডাক্তার বাবু, অনেকদিন আসেন না আমাদের এদিকে।'

খুব যে শক্ত অসুখ বিসুখ আছে এ বাড়িতে তার রকমসকম দেখে তা মনে হোল না। অমূল্যের পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম।

ভাড়াটে বাড়ির তিন খানা ঘর নিয়ে থাকেন মৃগাঙ্কবাবুরা। তার মধ্যে এক খান। তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী, আর একখানা বসবার, ভিতরের দিকের সবচেয়ে বড় ঘরখানায় সুদত্তার গৃহস্থালী। দেখলুম অন্য দু'খানা ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ। অন্দরের ঘরখানার সামনে এসে অমূল্য বলল, 'যান, মা আছেন ভিতরে।'

সাড়া পেয়ে সুদত্তাও এসে দাঁড়ালেন দোরের সামনে, 'আসুন, ভাবলুম আপনি বুঝি এলেনই না।'

দেখতে আরো যেন সুন্দর হয়েছেন সুদত্তা, প্রথম দিককার সেই উন্মত্ততা কেটে গেছে। প্রশান্ত, গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু দুই চোখের নিচে কেমন যেন বিষণ্ণতার আভাস।

বললুম, 'কি অসুখ আপনার।'

সুদত্তা একটু হাসলেন, 'এসেই অসুখের খোঁজ করছেন—'

বললুম, 'ডাক্তারদের কি কেউ সুখের দিনে ডাকে?'

সুদত্তা কোন জবাব দিলেন না।

ঘরের মধ্যে দোলনায় বছর খানেকের একটি শিশু ঘুমুচ্ছে, বললুম, 'ছেলে ভালো আছে তো?'

সুদত্তা বললেন, 'হ্যাঁ, বিশুর কোন অসুখ বিসুখ নেই।'

বললুম, 'বিশু?'

সুদত্তা একটু আরক্ত হয়ে উঠে বললেন, 'পিসীমার দেওয়া নামই রাখা হয়েছে। বিশ্বেশ্বর।'

গদি আঁটা চেয়ারটায় বসে বললুম, 'বেশ ভালো নাম হয়েছে। যাক্ অসুখ বিসুখ কিছু নেই তাহলে। শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম। খবর সব ভালো হোলেই ভালো। মৃগাঙ্কবাবু বাইরে গেলেন যে হঠাৎ?'

'হ্যাঁ, নাগপুরে গেছেন একটু। নতুন এক ধরণের গিনীপীগ নাকি দেখা গেছে সেখানে। তার কিছু সংগ্রহ করে আনবেন।'

অবাক হয়ে বললুম, 'গিনীপীগ! গিনীপীগ দিয়ে করবেন কি তিনি?'

সুদত্তা বললেন, 'ক্রসব্রীডিং নিয়ে উনি যে এক্স্পেরিমেণ্ট করছেন তাতে দরকার হবে।'

বললুম, 'ক্রসব্রীডিং!'

সুদত্তা আমার চোখের দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ, বায়োলজিই তো ওঁর এখন মেইন সাবজেক্ট, হেরিডিটি সম্পর্কে—'

তারপর সুদত্তা হঠাৎ বললেন, 'আমি আর পারছিনে ডাক্তার বাবু।'

একটু হাসতে চেষ্টা করে বললুম, 'বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী হলে এমন এক-আধটু উৎপাত—'

সুদত্তা তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'উৎপাত! বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী কি মানুষ নয় ডাক্তার বাবু? সে কি ইঁদুর না গিনীপীগ?'

তারপর একটু একটু ক'রে সবই খুলে বললেন সুদত্তা। তালা বন্ধ দুটো ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'বায়োলজির বই আর বোতল ভরা পোকা মাকড়ে দুটো ঘরই এখন ভরতি। বোধ হয় বিশুকেও ওর ভিতরে ভরে রাখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এনভিরনমেণ্টের প্রভাব পরীক্ষা করবার জন্য মানুষের বেলায় অতখানি সতর্কতার দরকার হয় না বোধ হয়।'

একটু হতভম্ব হয়ে বললুম, 'কি যে বলেন!'

সুদত্তা বলতে লাগলেন, তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন বিশুকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু কিছুতেই রাজী হন নি। নিজের জিনিস কি কেউ ছাড়ে? মৃগাঙ্কবাবুর চোখে বিশু একটা জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। বিশু তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার উপাদান। কিন্তু নিজের চোখে কিছুতেই এসব সহ্য করতে পারছেন না সুদত্তা। দামী পোষাক, দামী সব খাদ্য আর খেলনার ব্যবস্থা তিনি করেছেন বিশুর জন্য। দিনের মধ্যে অন্তত তিন চার বার খোঁজ নেন ছেলের, কোলে করে আদর করেন, চুমুও খান। তারপর হঠাৎ বিশুর দিকে চেয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখেন আর কলম খুলে নোট নেন পকেট বুকে। নিজের চোখে ওই দৃষ্টি কি ক'রে সহ্য করেন সুদত্তা?

কি বলব হঠাৎ ভেবে পেলাম না। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে দাঁড়ালুম, 'আজ একটু তাড়া আছে সুদত্তা দেবী। আজকের মত—'

সুদত্তা বাধা দিয়ে বললেন, 'না, আর একটু বসুন। আরো কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

অবাক হয়ে বললুম, 'আবার কি?'

একটু চুপ করে রইলেন সুদত্তা, মুহূর্তের জন্য বুঝি ইতস্তত করলেন একটু, তারপর হঠাৎ বললেন, 'দেখুন, এবারো আমি—! এবার আর তত এ্যাডভান্সড্ স্টেজ নয়। এবার আপনি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'কি বলতে চান আপনি?'

এতক্ষণ মুখ নিচু করে কথা বলছিলেন সুদত্তা, এবার সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। প্রথম দিনের সেই উন্মত্ত দৃষ্টি। যেন আজও তিনি ঠিক সহ্য করতে পারছেন না। কি একটা অপ্রবৃত্তি আর ঘৃণায় আজও যেন তাঁর সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠেছে।

সেদিনের মতই সুদত্তা সোজাসুজি আমার দিকে চেয়ে বললেন 'আমি যা চাই তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কম্প্যারেটিভ ষ্টাডির মেটিরিয়াল জোগাতে চাইনে।'

বাসব থেমে সিগারেট ধরাল। আমি সামান্য একটু মন্তব্য করতে যাচ্ছিলাম, করবী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রেডিও খুলে দিল। বক্তৃতা নয়, গল্পও নয়, 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান।'

অনুরোধের আসর।

করবী বলল, 'বাঁচলুম।'

হেডমাস্টার

টাইপ করা কতকগুলি জরুরী চিঠিপত্রে নাম স্বাক্ষর করছিলাম। টাইপিস্ট পরেশবাবু নিজে এসে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আজই চিঠিগুলি ডাকে পাঠাতে হবে। সই করতে করতে একটু ধমকও দিলাম পরেশবাবুকে, 'একেবারে ছুটির সময় নিয়ে এলেন, এক্ষুনি উঠব ভাবছিলাম।'

পরেশবাবু বোধ হয় তাঁর সহকারীর ঘাড়ে দোষটা চাপাতে যাচ্ছিলেন, বেয়ারা নিতাই এসে সামনে দাঁড়াল।

বিরক্ত হয়ে বললাম, তোমার আবার কি'।

নিতাই বলল, 'আরো একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, শ্লিপ দিয়েছেন।'

একবার তাকিয়ে দেখলাম, অফিসেরই ছোট্ট ভিজিটিং শ্লিপ। পেন্সিলে লেখা দর্শনপ্রার্থীর নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার। দেখা করতে চান নিরুপম নন্দীর সঙ্গে। উদ্দেশ্যটা উহ্য। হয়ত গুহ্য বলেই। নাম দেখে কারো মুখ মনে পড়ল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করে বেয়ারাকে বললাম, 'বল বসতে হবে। ব্যস্ত আছি।' চিঠিগুলিতে নাম স্বাক্ষর শেষ করতে না করতে ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বেয়ারা শীতল আর এক গাদা চেক এনে হাজির করল। চেকগুলির উল্টো পিঠে ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট্যান্টের সই চাই।

চটে উঠে বললাম, 'নিয়ে যাও। এখন সই হবে না।'

বেয়ারা চেকগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ক্লিয়ারিং-এর ইনচার্জ পরিমলবাবু নিজেই সেগুলিকে ফের বয়ে নিয়ে এলেন, 'সব ঠিক করে রেখেছি। শুধু আপনার সইটাই বাকি। কাল শনিবার। এসেই তাড়াতাড়ি হাউসে পাঠাতে হবে।'

বললাম, 'তা জানি, একটু আগে পাঠালেই পারতেন। এর পর থেকে কোন কাগজপত্রে ছুটোর পর আমি আর সই করব না।'

নির্মলবাবু মুখ কালো করে বললেন, 'অমনিতেই আমার ডিপার্টমেন্টে একজন লোক শর্ট আছে। তারপর বিনয়বাবু আজ আসেন নি। সব ঠিকঠাক ক'রে আনতে দেরি হয়ে গেল। এখন শুধু আপনার সইটা হলেই হয়ে যায়।'

শুধু সই, ভাবখানা এই, আমরা এত পরিশ্রম করেছি, আর আপনি শুধু সইটা করতে পারবেন না! সংক্ষেপে কেবল নিজের নামটুকু স্বাক্ষর করতে এত কষ্ট বোধ করছেন আপনি। কিন্তু সই করাটা যে সব সময় সহজ এবং প্রীতিপ্রদ নয় সে ধারণা এদের নেই।

মনে পড়ল ছেলেবেলায় নাম স্বাক্ষর করতে শিখে যেখানে-সেখানে দেয়ালে, কপাটে, বাবার নতুন পঞ্জিকায়, পুরোন দলিলে, নিরুপম নন্দীকে অমর করে রাখবার কি চেষ্টাই না করেছি। কিন্তু ঠেকে ঠেকে এখন শিক্ষা হয়ে গেছে। যত্রতত্র নাম স্বাক্ষর করতে আজকাল সহজে স্বীকৃত হই না। অনেক কুণ্ঠা, অনেক কার্পণ্য প্রকাশ করি। তা সত্ত্বেও অফিসের রাশি রাশি কাগজপত্রে নিত্যই যখন নাম স্বাক্ষর করতে হয়, তখন আর নামটাকে নিজের বলে মনে হয় না,—এমনকি অক্ষর পরিচয়ের ওপর ঘৃণা জন্মে যায়।

স্বাক্ষর পর্ব শেষ ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ টেবিলের ওপর সেই চিরকুটটি চোখে পড়ল। কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার। জ্বালাতন ক'রে ছাড়লে। বেয়ারাকে ডেকে বললাম, 'কে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন বাইরে। আসতে বল।'

একটু পরেই ভদ্রলোক আমার চেম্বারের কাটা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'একি মাস্টার মশাই, আপনি।'

আমাদের সাগরপুর এম, ই, স্কুলের হেড মাস্টার।

মাস্টার মশাই ততক্ষণ আমার সামনের চেয়ারটায় বসে বললেন, 'বসো, কয়েকদিন ধরেই আসব আসব ভেবেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এসে পড়লাম।'

ছেলেবেলার শিক্ষক। জোড় হাতে নমস্কার চলে না। পায়ে হাতে প্রণামই বিধেয়। কিন্তু ইউরোপীয় পোষাকে প্রণামের প্রাচ্যপদ্ধতির অনুসরণ অশোভন না হোক, অসুবিধাজনক। তবু একটু ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালাম। তারপর এগিয়ে এসে নিচু হয়ে মাস্টারমশাইর পাম্প ঢাকা পায়ে দুটো আঙুল ছোঁয়ালাম। আঙুলে অবশ্য ধুলো লাগল না কিন্তু মনে হলো নতুন কেনা টাইয়ের আগাটা মেঝের ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেছে।

সত্যিই পায়ের ধুলো নিই কিনা দেখবার জন্য মাস্টারমশাইও এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। এবার নিঃসংশয় হয়ে হাত ধরে বসিয়ে বললেন, 'থাক থাক, সিটে বস গিয়ে। ভাল তো সব?' নিশ্চিন্ত হয়ে আত্মপ্রসাদে এবার একটু হাসলেন মাস্টারমশাই। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম সামনের দুটো দাঁত মাস্টারমশাইর পড়ে গেছে। মনে পড়ল দাঁতের ওপর ভারি যত্ন ছিল মাস্টারমশাইয়ের। নিমের ডাল ভেঙ্গে রোজ সকালে দাঁত মাজতেন। লবঙ্গ, হরিতকি ছাড়া কোন দিন পান খেতে তাঁকে দেখিনি। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দাঁতের অধ্যায়টা একেবারে লাইন বাই লাইন মেনে চলতেন মাস্টারমশাই। তবু দন্তপংক্তিতে ভাঙ্গন ধরেছে।

ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে বললাম, 'দুটো দাঁত পড়ে গেছে দেখছি।'

মাস্টারমশাই ইংরেজীতে স্বীকৃতি জানালেন, 'yes, I have lost two of them. কিন্তু আর গুলো সব শক্ত আছে।'

শেষ কথাটায় মাস্টারমশাইর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠল। মৃদু হেসে বললাম, 'তারপর স্কুলের খবর কি বলুন। কেমন চলছে?'

মাস্টারমশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'স্কুল? তুমি কি দেশগাঁয়ের কোন খবরই রাখ না নাকি?'

অপরাধীর ভঙ্গিতে বললাম, 'না শীগগির কোন খবরটবর—

মাস্টারমশাই সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে বললেন, 'স্কুল আমি ছেড়ে দিয়েছি'। বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সেকি স্যার, আপনি স্কুল ছাড়লেন?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'হ্যাঁ ছেড়ে এসেছি। এসেছি যখন সবই বলব, সবই শুনবে। তার আগে যে জন্য আসা। একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করে দাও নিরুপম। তোমাদের অফিসে আছে নাকি খালিটালি কোন জায়গা?'

'আমাদের অফিসে?' মাস্টারমশাইর মুখের দিকে আমি একটুকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি কি পরিহাস করছেন? কিন্তু পরিহাসের সম্পর্ক তো নয়। তাছাড়া ঠাট্টা-পরিহাসের মত মুখের ভাবও তাঁর এখন নেই। দাঁতগুলো শক্ত থাকা সত্ত্বেও গাল দুটো ভাঙা ভাঙা, চোয়াল জেগে উঠেছে। গভীর রেখা পড়েছে কপালে। কালো লম্বাটে মুখখানায় কেমন এক ধরণের করুণ শীর্ণতা। মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, কিন্তু কালোর চেয়ে সাদা রঙের ভাঁজই চুলে বেশি। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলাম। হেড মাস্টারমশাইও বুড়ো হয়েছেন। তাঁর যুবক বয়সের কিশোর ছাত্র ছিলাম আমরা। মাস্টারমশাইর বার্ধক্যে নিজের বয়োবৃদ্ধি সম্বন্ধে যেন নতুন ক'রে সচেতন হয়ে উঠলাম।

কিন্তু একি বলছেন মাস্টারমশাই। পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে বয়স। এই বয়সে তিনি নতুন ক'রে চাকরিতে ঢুকবেন। মাথা কি ওঁর—। মাস্টারমশাইর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, 'স্কুল ছেড়ে এলেন কেন?'

মাস্টারমশাই রূঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ছেড়ে এলাম কেন? ছাড়ব না কি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরব? তাই বল তোমরা!'

বেয়ারা একবার দোর ঠেলে উঁকি দিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো বাজে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলুন মাস্টারমশাই বেরুনো যাক। যেতে যেতে সব শুনব।'

ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড় থেকে দক্ষিণ কলিকাতাগামী ট্রাম ধরলাম।

তারপর মাস্টারমশাইর পাশাপাশি বসে শুনতে লাগলাম সাগরপুর এম, ই স্কুল আর তাঁর ইদানীংকার ইতিহাস।

পাকিস্থানের হুজুগে গাঁয়ের বেশিরভাগ হিন্দু ছাত্র চলে আসায় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় দশ আনি কমে গেছে। বাকি ছয় আনির মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশি ছাত্রের কাছ থেকে নিয়মিত মাইনে আদায় হয় না। একমাত্র সরকারী সাহায্য পঞ্চাশ টাকা ভরসা। এম ই স্কুলের পাঁচজন মাস্টারের মধ্যে সেটা বাঁটোয়ারা হয়। সাহায্য বৃদ্ধির জন্য জেলা সহরে গিয়ে ধরাধরি করেছেন হেড মাস্টারমশাই, কিন্তু ইনস্পেক্টর এসে স্কুল পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিয়েছেন স্কুলের যা ছাত্র সংখ্যা তাতে পঞ্চাশের চাইতে বেশি সাহায্য সাগরপুর এম ই স্কুল আশা করতে পারে না। চার মাইল দূরে হোসেনপুরের নতুন এম ই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা সাগরপুরের দেড়া, অথচ সে স্কুলের বরাদ্দ পঞ্চাশের চাইতে এখনো পাঁচ টাকা কম আছে।

কিন্তু এতেও হেড মাস্টারমশাই ঘাবড়ান নি। টুকটাক ক'রে চালিয়ে নিচ্ছিলেন সংসার। সব চেয়ে বড় ভরসা ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারী নিত্যনারায়ণ চৌধুরী। চৌধুরী বাড়ীর টিউশনিও গোড়া থেকেই বাঁধা ছিল হেড মাস্টারমশাইর। নিত্যনারায়ণবাবুর ছোট ভাইদের থেকে সুরু ক'রে তাঁর ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতিনীদের পর্যন্ত হেড মাস্টারমশাই পড়িয়েছেন। প্রথমে পনের টাকায় আরম্ভ করেছিলেন। চৌধুরীমশাইর নাতি-নাতনীর সংখ্যা বছরের পর বছর বাড়তে থাকায় টিউশনির টাকার অঙ্কও বেড়ে বেড়ে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উঠেছিল। স্কুলে লিখতে হোত ষাট, মিলত চল্লিশ। মাইনের সঙ্গে টিউশনির এই উপ্‌রি টাকার সংযোগে সংসার চলত।

কিন্তু পাকিস্থান হওয়ার পর চৌধুরীরাও শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়লেন। ছেলেরা পুত্র-কলত্র নিয়ে কেউ কলকাতা, কেউ এলাহাবাদ, কেউ দিল্লী পর্যন্ত পাড়ি দিল। নিত্যনারায়ণ নিজেও এলেন শহরে। হেড মাস্টারমশাই বললেন, 'আপনারা সব শুদ্ধ চলে গেলে চলবে কি করে? আমরা কি করব?'

নিত্যনারায়ণ বললেন, 'তাইতো, মাস্টার, তোমার সমস্যাটা তো রয়েই গেল। ঝাড়িতে ছেলেপুলে তো কেউ রইল না। পড়বে কে।'

নিত্যনারায়ণের চার বছরের নাতনী পাপড়ি পয়সার লোভে দাদুর পাকা চুল বেছে দিচ্ছিল, সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এল। কেন দাদু, সরকারকাকা রইলেন, দারোয়ান মন বাহাদুর রইল, ঝি রইল, মাস্টারমশাই তাদেরই তো পড়াতে পারবেন।'

নিত্যনারায়ণ হো হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন, 'শুনলে? শুনলে মাস্টার? আমার দিদিমণির কথা শুনলে!'

কিন্তু নিত্যনারায়ণের হাসিতে সমস্যাটার সমাধান হয়নি। চৌধুরী চলে আসবার পর কুণ্ডুপাড়ায় হেড মাস্টারমশাই পাঁচ টাকার আরো দুটো টিউশান পেয়েছিলেন, কিন্তু নেন নি। সেকেণ্ড মাস্টারমশাইর মাস্টারী ছাড়াও মাতুল সম্পত্তি আছে, থার্ড মাস্টারমশাইর আছে মুদী দোকান, হেড পণ্ডিতের উপার্জনক্ষম দুই ছেলে, সেকেণ্ড পণ্ডিত শ্রীবিলাস চক্রবর্তীর যজমানী আর গুরুগিরি, কিন্তু হেড মাস্টারমশাইর সম্বল ছিলেন চৌধুরীরা। তিনি সব চেয়ে বেশি নিঃসম্বল হলেন। এদিকে পোষ্যের সংখ্যা অনেক।

গোড়ার দিকে তিনটি মেয়ে। তাদের দুটিকে অবশ্য পার করেছেন। একটি আছে এখনো ঘাড়ের ওপর। তারপর পর পর ছেলে হয়েছে তিনটি। বড়টির বয়স সবে সাত।

হেড মাস্টারমশাই বললেন, 'দেখলে বিধাতার মার। এমন অসময়ে ছেলেপুলেগুলি হোল—। নইলে গীতাকে কোন রকমে পার করতে পারলে আমার আর ভাবনা ছিল কি। ওই হতচ্ছাড়াগুলোর জন্যই তো—'

বুঝতে পারলাম ছেলেদের ভরণ-পোষণের ভাবনায় শেষ পর্যন্ত দেশ আর মাস্টারী দুই-ই তাঁকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। মনে পড়ল এই হেড মাস্টারীর ওপর কি মমতাই না ছিল মাস্টারমশাইর। টিচার হিসাবে সুখ্যাতি ছিল বলে রতনপুরে আর রাধাগঞ্জের দুইটি হাই স্কুলে মাস্টারমশাই

চান্স পেয়েছিলেন। কিন্তু যাননি। হাইস্কুলে তো আর হেডমাস্টার হয়ে যেতে পারবেন না। একবার আমাদের সাগরপুর এম, ই স্কুলকেও হাইস্কুল করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিলেন হেড মাস্টার-মশাই নিজে। কমিটির মিটিংএ বক্তৃতা দিতে উঠে বলেছিলেন, 'এ প্রস্তাব নিতান্তই অযৌক্তিক। এ গাঁয়ে হাইস্কুল চলবে না, চলতে পারবে না। যদি বা চলে খুঁড়িয়ে চলবে। কিন্তু অখ্যাত একটি হাইস্কুলের চাইতে কীর্তিমান, খ্যাতিমান একটি এম, ই স্কুলকে আমি বহুগুণে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।'

হেডমাস্টারের কথায় যুক্তি ছিল, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে দৃঢ়তা ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনের কোণের গোপন দুর্বলতাটুকু টের পেতে কমিটির অন্যান্য সভ্যদের দেরি হয় নি। এই নিয়ে তাঁরা কেবল গা টেপাটিপিই করেন নি আড়ালে আবডালে টিপ্পনীও কেটেছিলেন, এম, ই স্কুল হাইস্কুল হলে আমাদের হেড মাস্টারের হেডটুকু যাবে যে? হেডমাস্টার সব ছাড়তে পারে, কিন্তু সাগরপুর এম, ই স্কুলের ইন্দ্রত্ব কিছুতেই সে ছাড়তে রাজী নয়।

সেই ইন্দ্রপদও হেডমাস্টারমশাইকে ছেড়ে আসতে হোল।

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রাম থামতেই হেডমাস্টারমশাই উঠে দাঁড়ালেন, 'এখানে নামতে হবে আমাকে। হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটে বাসা, চল না নিরুপম। গীতা, গীতার মা তোমাকে দেখলে সবাই খুশি হবে। ওরাই তো আমাকে ঠেলে পাঠাল তোমার কাছে। গীতা কার কাছ থেকে যেন তোমার ঠিকানা জোগাড় করেছিল।'

মনে পড়ল না গীতার চেহারা, যখন মাইনর ক্লাসে পড়তাম দু তিনটি ছোট ছোট ফ্রক পরা মেয়ে দেখেছিলাম হেডমাস্টারমশাইর। হয়ত তাদেরই কেউ হবে, কিংবা তাদেরও পরে জন্মেছে। কিন্তু গীতাকে মনে না পড়লেও তার মার কথা মনে পড়ল। লুকিয়ে লুকিয়ে তখন সবে নভেল পড়তে শুরু করেছি, নায়িকার রূপ বর্ণনা পড়তে পড়তে হেডমাস্টারমশাইর

স্ত্রীর কথা মনে হোত। অমন সুন্দরী বউ আমাদের গাঁয়ে চৌধুরী বাড়িতেও ছিল না।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কাজ ছিল একটু সন্ধ্যার দিকে, আচ্ছা চলুন, দেখে যাই বাসা।'

কালীঘাটের টিনের বস্তী। তারই ভিতরে একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছেন হেডমাস্টারমশাই। সামনে খোলা দাওয়ায় তোলা উনানে রান্না উঠেছে।

হেডমাস্টারমশাই বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ঢুকলেন, 'আলোটা ধর গীতা, দেখ এসে নিরুপমকে নিয়ে এসেছি।'

ছোট্ট একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে, পিছনে পিছনে কৌতূহলী গুটি দুই ছেলেও এসে দাঁড়াল, হলুদ মাখা হাতে মাথায় আঁচল টানতে টানতে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একটু পৃথ্বাঙ্গী একজন মহিলা। চিনতে পারলাম ইনিই মাস্টারমশাইর স্ত্রী।

মাস্টারমশাই বললেন, 'নিরুপম নন্দী, আমার স্কুল থেকে থার্টিটুতে স্কলারশিপ পেয়েছিল ফার্স্ট হয়েছিল ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে। মনে আছে আমাদের বারান্দার তক্তপোষে রাত জেগে জেগে বৃত্তির পরীক্ষার পড়া পড়ত? নিরুপম নন্দী আর মুরুদ্দিন সিকদার। আচ্ছা নিরুপম, মুরুদ্দিন কোথায় আছে বলতে পার?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

তারপর নিচু হয়ে পায়ের ধূলো নিতে গেলাম মাস্টারমশাইর স্ত্রীর।

তিনি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'থাক থাক।'

একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন 'তোমার মুরুদ্দিন ফুরুদ্দিন এখন রাখ তো।'

তারপর আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন, 'আমাদের খুবই মনে আছে। তোমার বৃত্তি-পাওয়া কীর্তিমান ছাত্রের দলই মাস্টারমশাইদের একেবারে ভুলে গেছে।'

মাস্টারমশাইর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আগেকার সেই স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের সামান্যই অবশিষ্ট আছে। মাস্টার-মশাইর মত অবশ্য অতটা চেহারা খারাপ হয়নি, দাঁত পড়েনি, কি চুলও পাকেনি। কিন্তু কঠিন জীবন সংগ্রামের ছাপ প্রৌঢ়ত্বকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। তা সত্বেও হাসিটুকু ভারি ভালো লাগল, ভারি মিষ্টি লাগল অভিযোগের ভঙ্গিটুকু।

বললাম, 'ভুলব কেন, তবে নানারকম কাজ-কর্মের চাপে খোঁজখবর আর নিয়ে ওঠা হয়নি।'

'ওঁরা কি দাঁড়িয়ে থাকবেন মা। বসতে বল না তক্তপোষে।'

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। এই বোধ হয় মাস্টারমশাইর মেয়ে গীতা। মায়ের মত অত সুন্দরী নয়। রঙটা একটু ময়লা। কিন্তু মায়ের চেয়ে স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু দীর্ঘ দোহারা চেহারায়, মুখের ডৌলে, নাক চোখের সুন্দর গড়নে ষোল সতের বছর আগেকার আর একটি তরুণী গৃহিণীর কথা মনে পড়ল। জ্যামিতির উপপাদ্য মুখস্থ করতে করতে হ্যারিকেনের তেল যখন ফুরিয়ে যেত, সলতে আসত নিবু নিবু হয়ে তখন মাস্টারমশাইর স্ত্রী উঠে এসে বোতল থেকে আমাদের হ্যারিকেনে তেল ঢালতে ঢালতে বলতেন, 'আর পারিনে। বৃত্তি পেয়ে মাস্টারমশাইকে মহারাজ করবেন। কাল থেকে বোতলে ক'রে বাড়ি থেকে তেল নিয়ে এস নিজেরা। আমি আর এক ফোঁটা তেলও দিতে পারব না।'

কিন্তু নিপুণ হাতে হ্যারিকেনের মুখটুকু আটকে দিয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে স্নিগ্ধস্বরে বলতেন, 'নিরু, নুরুদ্দিন তোমাদের বোধ হয় খুব মশা লাগছে। মশারী টাঙিয়ে দিয়ে যাব? মশারীর মধ্যে বসে পড়বে?'

নুরুদ্দিন জবাব দিত, 'না মাসীমা। মশারীর মধ্যে গেলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। তার চেয়ে মশার কামড় বরং ভালো।'

মাসীমা হেসে উঠতেন, 'প্রায়ই বিবেকের কামড়ের মত, তাই না?

ওদিকে ঘরের মধ্যে মশারীর ভিতরে আর একজনকে বিবেকে কামড়াচ্ছে। অতিষ্ঠ হয়ে তিনিও উঠে এলেন বসে।'

মাসীমা চলে গেলে আমি আর মুরুদ্দিন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতাম। মাইনর ক্লাসে পড়লে কি হয়, গোঁফের রেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঠোঁটে। গাঁয়ের ছেলে আন্দাজে আভাসে তখন থেকেই একটু-আধটু সব বুঝতে শিখেছি!

তক্তপোষে পা ঝুলিয়ে বসে চা জলখাবার খেতে খেতে মাস্টারমশাইর আরও খানিকটা ইতিহাস শুনলাম মাসীমার মুখে। চৌধুরীরা ছেড়ে এলেও মাস্টারমশাই স্কুল ছাড়তে ইতস্তত করছিলেন, বলছিলেন, 'স্কুলের কি দশা হবে?'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী রাগ করে বলেছিলেন, 'যে দশা হয় হোক। আমাদের দশাটা কি তোমার চোখে পড়ছে না? স্কুলের ভাবনা কি, তুমি চলে গেলে সেকেণ্ড মাস্টার হোক্ থার্ড মাস্টার হোক্ একজনকে ওরা হেড-মাস্টার বানিয়ে নেবে। ভারি তো বিদ্যা লাগে তোমার ওই এম, ই স্কুলের হেডমাস্টারীতে।'

মাস্টারমশাই তবুও বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু বুঝি না, তুমি থাক তোমার হেডমাস্টারী নিয়ে, আমি চললাম। ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতে পারব না।'

মাসীমার দুই দাদা থাকেন ভবানীপুরে। একজন উকিল, আর একজন পুলিস ইনস্পেক্টর, তাঁদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করলেন মাসীমা, তাঁরা বললেন, 'বেশ চলে এস, একটা গতি হবেই।'

কিন্তু থাকবার মত ঘর নেই বাড়িতে। সপ্তাহ দুই থাকবার পর নানারকম অসুবিধা হ'তে লাগল। দাদা বললেন, 'অন্য একটা ঘরটর কোথাও খুঁজে নে। আমরা যা পারি কিছু কিছু—'

এদিকে ঘরও মেলে না শহরে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে শেষে এই

হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের গলিতে মিলেছে বাসা। এই তো ঘর—আলো নেই, হাওয়া নেই, জল আনতে হয় রাস্তার কল থেকে। তবু মাসে মাসে এরই ভাড়া গুণতে হয় কুড়ি টাকা। ছ' মাসের ভাড়া আগাম দিতে হয়েছে বাড়িওয়ালাকে। মাঝখানে পাড়ার একটা রেশনের দোকানে খাতা লেখার চাকরি পেয়েছিলেন মাস্টার মশাই কিন্তু দু' মাস যেতে না যেতে কি সব গণ্ডগোলে গভর্ণমেন্ট সে দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। এখন মাসখানেক ধ'রে একেবারে বেকার।

মাসীমা বললেন, 'তোমরা একটা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা এবার করে দাও নিরুপম।'

বললাম, 'আচ্ছা দেখি। আমাদের টালীগঞ্জ হাইস্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে মোটামুটি জানাশোনা আছে। তাঁকে বলে টলে সেই স্কুলে যদি মাস্টার মশাইকে—'

মাস্টারমশাই প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'না নিরুপম, আর মাস্টারী নয়। না খেয়ে মরবো, তবু মাস্টারী আর জীবনে করব না। কেরানীগিরি থেকে কুলিগিরি যা বল করতে রাজী আছি। কিন্তু মাস্টারী আর নয়। সাতাশ বছর ধ'রে মাস্টারী করার সুখ তো দেখলাম। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।'

মাসীমা বললেন, 'উনি মাস্টারী আর করতে চাইছেন না। অন্য কোন কাজকর্ম—'

আমি কিছু বলবার আগে গীতাই তার মাকে মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলল, 'কি যে বল মা, নতুন অফিসে ঢুকবার মত বয়স কি স্বাস্থ্য আছে নাকি বাবার।'

মাস্টারমশাই ধমক দিয়ে বললেন, 'না নেই, ওকে বলেছে নেই। কি হয়েছে আমার স্বাস্থ্যের। দেখতো নিরুপম, ছেলেবেলাও তো দেখেছ, এখনো দেখ।'

বলে মাস্টারমশাই পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে তাঁর বাইসেপ দেখালেন

আমাকে, 'It is as strong as ever.' দেখ, টিপে দেখ। তোমার প্রায় ডবল বয়সী হব তো আমি। কিন্তু বাজী রেখে বলতে পারি এখনো তুমি যতটা হাঁটতে পারবে, দৌড়তে পারবে তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম পারব না আমি। কলেজ [illegible] একদিনও কেউ আমাকে গরহাজির হতে দেখেনি। বয়স হয়েছে বলে শরীরের সেই ফরম-টরম একেবারেই কি ধুয়ে মুছে গেছে? স্পোর্টস-এও কারো চেয়ে কম যেতাম না। ফুটবলে অফেন্সের চেয়ে ডিফেন্সই আমাকে অবশ্য বেশি খেলতে হ'ত। আমি যেদিন গোলে না দাঁড়াতাম—'

এবার স্ত্রীর ধমক খেলেন মাস্টারমশাই। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ থাম, ওসব কে শুনতে চাইছে তোমার কাছে।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'মাসেলটা একটু টিপে দেখই না নিরুপম।'

মাসেলের চাইতে মাস্টারমশাইর বাহুর ওপর দিয়ে যে রগগুলো জেগে উঠেছে তাই আমার চোখে পড়ল বেশি। তবু বললাম, 'না না না, শরীর তো বয়সের তুলনায় সত্যিই বেশ ভাল আছে আপনার। তাছাড়া বয়সটাই বা কি। ওদের দেশে তো শুনি ষাট বছরে জীবন কেবল আরম্ভ হয়। আপনার কত হবে? বছর পঞ্চান্ন—'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী বললেন, 'না না না! এই বৈশাখে সবে একান্নতে পড়েছেন।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'এক্সাক্টলি, যাস্ট ফিফ্‌টিওয়ান। কিন্তু দৌড়ে, সাঁতারে যেকোন একুশ বছরের ছেলের সঙ্গে যদি তুমি আমাকে পাল্লা দিতে বল—'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী আবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'কি যা তা বলছ। অফিসের চাকরীতে দৌড় ঝাঁপের জন্য কে ডাকতে যাচ্ছে তোমাকে।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তবে ওঁর মত

ইংরেজী লিখতে আমি কাউকে আর দেখিনি নিরুপম। আমার বড় দাদা এম এ. বি এল হলে কি হবে ইংরেজীতে ওঁর সঙ্গে পেরে ওঠে না। লেখার বাঁধুনী তো দূরের কথা, হাতের লেখাটাই যেন কেমন কাঁচা কাঁচা, আমাদের মেয়েদের মত। কিন্তু ওঁর লেখা সম্বন্ধে সে কথা কেউ বলতে পারবে না। আর লেখেনও খুব তাড়াতাড়ি। পাড়ার লোকের পক্ষে থেকে সেদিন ডাস্টবিন দেওয়া সম্বন্ধে কর্পোরেশনে একটা দরখাস্ত করেছিলেন। টাইপ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাতের লেখা কাগজটা আছে এখানে। কাগজখানা আন দেখি গীতা, দেখা তোর নিরুপমদাকে।'

গীতা কাগজখানা খুঁজতে লাগল।

মাস্টারমশাই তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, 'আমার ছাত্রের কাছে আমার বিদ্যার সার্টিফিকেট আর দিতে হবে না তোমাকে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত লেখার ব্যাপারে নিরুপম যেমন ছিল শ্লো, তেমনি ওর হাতের লেখা ছিল কদর্য। ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম ওকে নিয়ে। একটা বছর স্কুলের স্কলারশিপটা বুঝি বাদই যায়। অথচ অঙ্ক, বাঙলা, ইতিহাস, ভূগোল সব বিষয়েই ভালো। কেবল ইংরাজী। ভাবলাম দু'বছরে একটা বিষয়ে কি আর টেনে তুলতে পারব না? থার্ডমাস্টার, পণ্ডিতমশাই সব হাল ছেড়ে দিলেন, কিন্তু আমি অত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। হাতের প্রত্যেকটি অক্ষর ধরে ধরে শুধরে দিয়েছি, বেত মেরে মেরে মুখস্থ করিয়েছি গ্রামারের প্রত্যেক রুল।'

মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে পরম আত্মপ্রসাদে ফের হাসলেন, 'গ্রামারে আর বোধহয় তোমার ভুল হয় না, না নিরুপম?'

ভাষার গ্রামারের কথা জানি না, জীবনের গ্রামারে এখনো যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি হয়। কিন্তু সেকথা মাস্টারমশাইর কাছে স্বীকার না করে নিজের বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধির কথাই ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম।

ফেরার সময় সরু গলির মোড় পর্যন্ত দু'জনেই এলেন পিছনে পিছনে।

মাস্টারমশাইর স্ত্রীর হাতে হারিকেন লণ্ঠন। বিদায়ের আগে তিনি আর একবার বললেন, 'তোমার ভরসাতেই কিন্তু রইলাম নিরুপম।'

বললাম, 'আচ্ছা, সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা নয়, কিছু একটা তোমাকে করে দিতেই হবে। সবই তো শুনলে।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

প্রথমে মার্চেণ্ট অফিসের দু' চারজন বন্ধুকে বললাম মাস্টারমশাইর কথা। কেউ কেউ মুচকি হাসল, কেউ বা সশব্দে। মার্টিনের সতীশ বলল, 'এতই যদি গুরুভক্তি নিজের ব্যাঙ্কেই নিয়ে যাও-না কেন।'

ধরলাম জেনারেল ম্যানেজার মিঃ গুপ্তকে। লোকজন নেওয়ার ভার তাঁরই হাতে।

তিনিও প্রথমে হাসলেন, 'বলছ কি নন্দী। একান্ন বছর বয়সে নতুন চাকরী। তারপর সাতাশ বছরের মাস্টারী। শুনি ও কাজ বারো বছর করলেই নাকি—। ব্যাঙ্কের এসব ফিগার ওয়ার্ক টোয়ার্ক তিনি কি পারবেন? তাছাড়া খাটুনিও তো কম নয়।'

বললাম, 'তিনি বলছেন, মাস্টারী ছাড়া তিনি সব পারবেন, সব করবেন। মাস্টারীতে নাকি তাঁর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। যাই হোক আমাদের ব্যাঙ্কে ওঁকে একটা চান্স আপনার দিতেই হবে মিষ্টার গুপ্ত।'

'আচ্ছা, তুমি যখন বলছ অত ক'রে দেখা যাক।'

ইন্টারভিউর জন্য আর চিঠি পাঠান হল না। মুখেই খবর দিয়ে এলাম। সবাই খুব খুশি।

গীতা বলল, 'না নিরুপমদা, চা না খেয়ে যেতে পারবেন না।'

মাস্টামশাইর স্ত্রী বললেন, 'দেখ দেখি বৈয়মটায় সুজি আছে খানিকটা। আর ওই টিনের কৌটোর মধ্যে চিনি আছে।'

বললাম, 'আবার ওসব কেন? শুধু চা হলেই তো হোত।

'ওই চা-ই, চা ছাড়া আর কিইবা তোমার সামনে ধরে দেওয়ার শক্তি আছে।'

চায়ের সঙ্গে একটু হালুয়াও প্লেটে ক'রে সামনে এনে রেখে দিল গীতা।

মৃদু হেসে বললাম, 'মিষ্টিমুখটা চাকরী হওয়ার পরে করালেই তো ভাল হোত।'

গীতা কোন জবাব দিল না, তার মা বললেন, 'তুমি যখন রয়েছ, ও চাকরী হওয়ায় মধ্যেই। তা ছাড়া চাকরীর জন্য কি। গরীব মাস্টার-মশাইর বাসায় অমনিতেই না হয় একটু চা আর খাবার খেলে। তাতে জাত যাবে না।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'মাস্টারী ছেড়ে দিলাম, তবু মাস্টার মাস্টার করা ছাড়লে না তোমরা।'

মাস্টারমশাইর স্ত্রীও এবার হাসলেন একটু, 'আহা ছেড়ে দিলেও নিরুপমের তো মাস্টারমশাই তুমি।'

মাস্টারমশাই বললেন 'এখনো আছি, কিন্তু দু' দিন বাদে চাকরীটা যদি হয়েই যায় ওদের ওখানে, তখন আর মাস্টার নয়, কলীগ, সাবঅরডিনেট।'

চাকরি হলও। মিঃ গুপ্ত খুবই ভদ্রতা করলেন। ইণ্টারভিউতে নাম ধাম ছাড়া বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কেবল বলেছিলেন, 'এতদিনের মাস্টারী ছাড়লেন কেন, তাছাড়া ব্যাঙ্কের কাজকর্ম কি আপনার ভালো লাগবে।'

মাস্টারমশাই জবাব দিয়েছিলেন, 'মাস্টারীর মনোটনির তুলনায় সব কাজই বোধ হয় ভালো।'

মিঃ গুপ্ত মৃদু হেসে বলেছিলেন 'বেশ দেখুন, কেমন লাগে।'

বিশেষভাবে ধরে পড়ায় মাইনের বেলায়ও বেশ একটু খাতির করলেন মিঃ গুপ্ত, আমাদের ব্যাঙ্কে সাধারণত আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের স্টার্টিং ষাটে। জেনারেল ম্যানেজারকে বললাম, 'কিন্তু ওঁর নিজের বয়সই তো প্রায় ষাট

হ'তে চলল, এই বয়সে ষাট টাকা দিয়ে উনি করবেন কি,—তাছাড়া অতগুলি পোয়া।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে খানিকক্ষণ কি পরামর্শ ক'রে আরও খানিকটা দাক্ষিণ্য দেখালেন জেনারেল ম্যানেজার। স্পেশাল কেস হিসাবে গণ্য ক'রে ষাট থেকে উঠলেন পঁচাশিতে। বললেন, 'দেখি কাজ কর্ম কি রকম করেন না করেন, তারপর দেখা যাবে।'

সপরিবারে মাস্টারমশাই কৃতজ্ঞতা জানালেন। এম ই স্কুলে সারা জীবন থাকলেও এত টাকা পেতেন না মাস্টারমশাই।

চৌধুরীদের টিউশনির টাকা ধরেও সংখ্যাটা অতখানি উঁচুতে পৌছত কি না সন্দেহ। খবর পেয়েই কালীবাড়িতে ডালা [illegible] মাস্টারমশাইর স্ত্রী। গীতার চায়ের সঙ্গে ফুলের পাপড়ি শুদ্ধ প্রসাদের অংশও পেলাম।

গীতা মৃদুস্বরে বলল, 'মা ভারি খুশি হয়েছেন।'

বললাম, 'আর তুমি?'

গীতা বলল, 'আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিন, আমিও হব।'

হেসে বললাম, 'খুশি হবার জন্য জুটিয়ে অবশ্য তোমাকে কিছু একটা দিতে হবে, কিন্তু সে চাকরি কি না তাই ভাবছি।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে গীতা একটু আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট সরল গদ্যে বলল, 'না নিরুদা, আজকালকার মেয়েদের আর কিছু জুটিয়ে দিয়ে খুশি করবার দরকার হয় না। তার চাইতে একটা কাজকর্মের সন্ধান দিলেই তারা সব চেয়ে বেশি খুশি হয়।'

প্রথমে পরিমল বাবুর ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টেই দিলাম মাস্টারমশাইকে, তিনি লোক চেয়েছিলেন। অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টেও অবশ্য লোকের দরকার। তবু পরিমলবাবুকেই সবচেয়ে আগে খাতির করলাম।

পরিমলবাবু কিন্তু এ্যাসিস্ট্যাণ্ট পেয়ে খুব খুশি হলেন না। বললেন, 'শেষ পর্যন্ত একজন চুল পাকা বুড়োকে পাঠালেন আমার ডিপার্টমেণ্টে?'

পরিমলবাবুর নিজের বয়সও চল্লিশ বিয়াল্লিশের কম হবে না, ঘরে বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছেলের সন্ধান করেন আমার কাছে।

হেসে বললাম, 'অত বয়স বিচার করছেন কেন পরিমলবাবু? জামাই তো আর নিচ্ছেন না, এ্যাসিস্ট্যাণ্টই নিচ্ছেন। বয়স দিয়ে কি হবে, আপনার কাজ চলে গেলেই হোল। গোড়াতে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে।'

ছুটির পরে ডালহৌসীর মোড়ে মাস্টারমশাইর সঙ্গে দেখা। দেখলাম এই বয়সে প্রায় তরুণ জামাইর মতই সেজেছেন মাস্টারমশাই। যখন স্কুলে পড়েছি, তখন এত পারিপাট্য দেখিনি। ইস্ত্রী করা সাদা পাঞ্জাবীতে কালো বোতাম লাগানো। ঝুলন্ত কোঁচাটা নিপুণ হাতে কোঁচানো, পায়ের পাম্পশুটা পুরোন হলেও সদ্য পালিসে চক্ চক্ করছে। গোঁফ দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। চুলটা বোধ হয় আজই ছেঁটেছেন। সেলুনের ছাঁট বেশ বোঝা যায়। স্কুলে যখন ছিলেন, তখন জামা থাকতো বোতাম থাকত না, হয়তো দু পাটি চটির দু'খানা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

বললাম, 'অফিস কেমন লাগছে মাস্টার মশাই?'

মাস্টারমশাই একটু হাসলেন বললেন, 'ভালোই তো,'

ট্রামে পাশাপাশি বসে হঠাৎ বলে ফেললাম, 'একদিনেই আপনি যেন আমূল বদলে গেছেন। স্কুলের অন্যান্য মাস্টারমশাইরা আপনাকে দেখলে এখন আর চিনতে পারবে না।'

মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন 'কেন?'

বললাম, 'তখনকার পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে একেবারেই তো কোন মিল নেই কি না। এবার দাঁত দুটো বাঁধিয়ে নিলেই—' মনে হোল ঠিক আগেকার দিনের মত ক্রুদ্ধ চোখে মাস্টার মশাই আমার দিকে তাকালেন।

একটু লজ্জিত হলাম। এতখানি প্রগল্‌ভতা হঠাৎ না দেখালেও পারতাম। তখনকার দিনে হেডমাস্টারমশাইর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতাম না, আর এখন দিব্যি ঠাট্টা তামাসা করছি। এতখানি আধুনিকতা মাস্টারমশাই সহ্য করতে পারবেন কেন।

ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম মাস্টারমশাইর তাকাবার ভঙ্গিটা এরই মধ্যে বেশ বদলে গেছে।'

মনে হোল আমার দিকে চেয়ে মাস্টারমশাই একটু হাসলেন বললেন, 'ও আমার সাজসজ্জার কথা বলছ। তুমি বুঝি ভেবেছ এসব আমি নিজের গরজে নিজের হাতে করেছি?'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তবে? গীতা বুঝি?'

মাস্টারমশাই মাথা নেড়ে রহস্যগভীর স্বরে বললেন, 'তাও নয়।'

বললাম, 'তবে?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'লাবণ্য, I mean গীতার মা,' মাস্টারমশাইর স্ত্রীর নামটা এবার মনে পড়ে গেল। তখনকার দিনে লাবণ্যলেখা সরকারের নামে প্রায়ই চিঠি যেত ডাকে। গাঁয়ের পোস্টঅফিসে পিওন ছিল না। পোস্টমাস্টারের হাত থেকে আমরাই চিঠি নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিতাম। ভারি সুন্দর লেগেছিল নামটি। লাবণ্যলেখা, মনে হয়েছিল তাঁর স্বভাবের সঙ্গে, চেহারার সঙ্গে নামটি চমৎকার মানিয়ে গেছে। এছাড়া তাঁর অন্য কোন নাম যেন কল্পনাই করা যেত না।

এতদিন বাদে স্ত্রীর নাম আমার সামনে উচ্চারণ ক'রে ফেলে মাস্টারমশাই নিজেও যেন ভারি লজ্জিত হয়ে পড়লেন। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকালেন বাইরের দিকে, গড়ের মাঠের ওপারে গঙ্গা, গঙ্গার ওপারে লাল হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। লজ্জায় কি আরক্ত দেখাচ্ছে মাস্টারমশাইর মুখ, না কি এ রঙ সূর্যাস্তের। একটু বাদে ফের মুখ ফেরালেন, মাস্টারমশাই বললেন, 'এ সব গীতার মার কাণ্ড। বাধা দিয়েছিলাম, বলেছিলাম লোকে হাসবে যে। সে জোর করে বলল, না হাসবে না। আর হাসে যদি হাসলই বা। এতদিন নিজের হাতে বেশভূষা করে লোক হাসিয়েছ আজ না হয় আমার জন্যই হাসালে।'

আমি প্রতিবাদ ক'রে বললাম, 'না না হাসবার কি হয়েছে মাস্টারমশাই।'

মাস্টারমশাই আমার কথা যেন শুনতে পাননি, নিজের মনেই বললেন, 'ভাবলাম ওর কোন সাধ আহ্লাদ তো মেটেনি, আজ যদি এভাবে একটু মেটাতে চায় মেটাক।'

মনে হোল আমার পাশে বসে আমাদের ছেলেবেলার বেত হাতে সেই কড়া হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার আর কথা বলছেন না, অন্নচিন্তায় কাতর পঞ্চাশ বছরের কোন প্রৌঢ় কেরানীও নয়, ইনি সম্পূর্ণ আর একজন। স্ত্রীর অপূর্ণ সাধ আহ্লাদের কথা জীবন সায়াহ্নে যাঁর মনে পড়ে গেছে।

কথায় কথায় এম ই স্কুলের হেডমাস্টারের জীবনের আর এক গোপন অধ্যায় আমার কাছে উদ্ঘাটিত হোল।

লাবণ্যলেখা তখন গীতা, গোবিন্দের মা নন এমন কি আমাদের শ্রদ্ধেয় হেডমাস্টারমশাইর স্ত্রীও নন; সিটি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কৃষ্ণপ্রসন্নের সখের ছাত্রী তখন লাবণ্য।

কৃষ্ণপ্রসন্ন তখন কলেজ হস্টেলে থাকে। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে ডিবেটিং ক্লাবে জোর বিতর্ক করে। জিমনাশিয়ামে বার বার বারবেলের খেলা দেখায়। ফুটবলে তেমন আসক্তি না থাকলেও টিমের ক্যাপ্টেন জোর করে তার হাতে তুলে দেয় গোলরক্ষার দায়িত্ব, এসব ছাড়া অবসর বিনোদনের আরও একটু জায়গা আছে কৃষ্ণপ্রসন্নের, শ্যামবাজারের নলিন সরকার স্ট্রীটের একটি দ্বিতল বাড়ীর দক্ষিণ খোলা একখানা ঘরে। বাড়ীটি একেবারে নিঃসম্পর্কিত নয়। জেঠতুতো বোনের শ্বশুরবাড়ী। দিদির শ্বশুরের সেজো মেয়ে লাবণ্য। চৌদ্দ উৎরে পনেরোয় পড়েছে। পড়াশুনোয় ভারি আগ্রহ। কিন্তু দিদির শ্বশুরমশাই এসব বিষয়ে ভারি রক্ষণশীল। মেয়েকে ইংরেজী স্কুলের দু তিন ক্লাস পড়িয়েই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। এনে তুলে দিয়েছেন পাকা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো মাস্টারের হাতে। কৃষ্ণপ্রসন্নের পরম ভাগ্য দিদির শ্বশুরবাড়ীতে যাতায়াত শুরু করার দিন পনের যেতে না যেতেই সেই বুড়ো মাস্টারের শক্ত অসুখ হোল। দিদির শ্বশুরের মত বন্ধ আর

দেবরেরা সেকেলে নয়। তাঁরা বললেন, 'লাবুর পরীক্ষা এসেছে, কৃষ্ণপ্রসন্ন তুমিই একটু ওকে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও না।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন জিভ কেটে বলেন, 'ওরে বাবা, থিয়েটার বাড়ী থেকে নায়দের এক গোছা পাকা দাড়ি তাহলে ধার করে আনতে হয়।'

কিন্তু দাড়ি ধার করবার দরকার হোল না। দিদি আর দিদির শাশুড়ীর সার্টিফিকেটে কৃষ্ণপ্রসন্নই তরুণ হয়েও বসতে শুরু করল সেই বুড়ো মাস্টারের পরিত্যক্ত চেয়ারে। প্রথমে কেউ কোন কথা বলে না, কেউ কারো দিকে তাকায় না, বইয়ের দিকে দুজনেই চোখ নিচু ক'রে থাকে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি যে ছাপার অক্ষরে আবদ্ধ থাকে না। তারপর মাস তিনেক বাদে ফের যখন সেই বুড়ো মাস্টারমশাইর আসবার কথা হোল লাবণ্য বলল, 'আমি আর তাঁর কাছে পড়ব না।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বলেন, 'তবে কার কাছে পড়বে?'

'এখন যার কাছে পড়ছি।'

'বা রে আমি কি সারা জীবন মাস্টারী করব নাকি?'

লাবণ্য হেসে বলল, 'করবেই তো, মাস্টারীর মত এমন মহৎ কাজ আর নেই।'

কিন্তু দু'বছর বাদে গাঁয়ের এম, ই স্কুলে হেড মাস্টারী নেওয়ার সময় এই লাবণ্যই সবচেয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। জেঠতুতো বোনের মধ্যস্থতায় লাবণ্য তখন শুধু আর কৃষ্ণপ্রসন্নের ছাত্রীই নয়, সাগরপুর সরকার বাড়ীর বউ হয়ে ঘরে এসেছে। আর বি, এ পরীক্ষা দিতে বসে এক জ্ঞাতি ভাইয়ের মুখে স্ত্রীর ডবল নিউমোনিয়ার খবর পেয়ে পরীক্ষার হল ছেড়ে একেবারে দেশে চলে এসেছে কৃষ্ণপ্রসন্ন। বাবা বললেন, 'ইচ্ছা করেই আমরা খবর দিইনি। পরীক্ষার চেয়ে তোর বউ বড় হোল?'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বলল, 'স্ত্রীর জীবনের চাইতে আমার পরীক্ষা বড় নয়।'

রোগটা ঠিক ডবল নিউমোনিয়া ছিল না। অল্প দিনেই লাবণ্য উঠে বসল এবং উঠে বসেই বলল, 'তোমার পরীক্ষার কি হোল ?'

কৃষ্ণপ্রসন্ন জানাল পরীক্ষা সে দেয়নি।

লাবণ্য বলল, 'ছি ছি ছি আমার জন্ত তুমি পরীক্ষা বন্ধ করলে? আমি মুখ দেখাব কেমন করে ? তুমি এক্ষুনি ফের কলকাতায় চলে যাও।

কৃষ্ণপ্রসন্ন অতদূর গেল না। তখন দক্ষিণ পাড়ার চৌধুরীদের উদ্যোগে নতুন এম, ই স্কুল হচ্ছে গাঁয়ে। নিত্যনারায়ণ তাকে ধরে বসলেন, 'তোমার কলেজ খোলার তো ঢের দেরি। তার আগে আমাদের স্কুলটা একটু ঠিকঠাক করে দিয়ে যাও।' তারপর কতবার কলেজ খুললো, বন্ধ হোল। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্নের আর যাওয়া হোল না।

লাবণ্য বলেছিল, 'তুমি কি সত্যিই মাস্টারী নিলে ?' কৃষ্ণপ্রসন্ন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হেসেছিল,

'নিলামই বা। মাস্টারীই তো সব চেয়ে মহৎ বৃত্তি।'

বাড়ীর আর গাঁয়ের সব লোক জানল বউকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে পারবে না বলেই কৃষ্ণপ্রসন্ন বিদেশে গেল না। এমন স্ত্রৈণ পুরুষ আর দুটি নেই। লাবণ্য জানল অবশ্য অন্য কথা। তারপর—তার একটানা সাতাশ বছর।

হাজরা রোডের মোড়ে নেমে যাওয়ার আগে ফের সাতাশ বছরের পরের একটু খবর দিয়ে গেলেন মাস্টারমশাই, হেসে বললেন, 'ছেলেমেয়েদের চোখের আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে গীতার মা চুপি চুপি আমাকে কি জিজ্ঞেস করেছিল জানো নিরুপম ?'

বললাম, 'কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?'

মাস্টারমশাই একটু হাসলেন, 'আচ্ছা, নিরুপমের মত সবাই কি স্যুট পরে আসে ?' তার মানে সবাই যদি স্যুটধারী হয়, তাহলে আমারও পরিত্রাণ নেই। তাহলে তাঁর বড় বউদির কাছ থেকে তাঁর দাদার পুরোন একটা স্যুট ধার করে আনবেন আর তাঁর বউদিদের মতই নিজের হাতে টাই

বাঁধবেন আমার গলায়। হেসে বললাম, 'সামনের মাসে আপনাকে একটা স্যুট আমি করিয়ে দেব মাস্টারমশাই।'

'পাগল নাকি? এই ধুতী পাঞ্জাবির চোটেই অস্থির। দু'বার ক'রে নিজের হাতে কেচেছে পাশের বাসার ইস্ত্রীটা চেয়ে এনে ইস্ত্রী করেছে, কেবল কি তাই? কোঁচাটা পর্যন্ত নিজের পছন্দমত কুঁচিয়ে দেওয়া চাই। বলে কি জানো।—এ তো তোমার গাঁয়ের স্কুল নয়, শহরের অফিস।' হেড মাস্টারমশাই ফোকলা দাঁতে একটু হাসলেন। তা সত্ত্বেও দাঁতের সেই বিশ্রী ফাঁক আমার চোখে তেমন যেন আর বিসদৃশ লাগল না। কারণ সাতাশ বছর আগেকার সেই লাবণ্য আর কৃষ্ণপ্রসন্ন আমার মনকে তখনো আচ্ছন্ন করে রয়েছে।

কিন্তু মাস্টারমশাই সম্বন্ধে এই রোমান্টিক আচ্ছন্নতা বেশি দিন বজায় রইল না। সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই ঝড়ের বেগে ক্লিয়ারিং-এর পরিমলবাবু আমার চেম্বারে এসে ঢুকলেন।

বললাম, 'ব্যাপার কি পরিমলবাবু?'

'আচ্ছা নিরুপমবাবু, ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ আমি না কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু?'

বললাম, 'আপনি, এতো সবাই জানে।'

'কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু জানেন না। জানলেও মানেন না।' তারপর অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ দিলেন পরিমলবাবু। এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েও কথায় কথায় তাঁর সমালোচনা করেন মাস্টারমশাই। ছোকরা কর্মচারীদের সামনে তাঁর ইংরেজীর ভুল ধরেন। কথাবার্তার খুঁৎ ধরেন। মুহূর্তে মুহূর্তে কাজের ব্যাঘাত হয়। পরিমলবাবু বললেন, 'লোকের আমার আর দরকার নেই মশাই, একজন লোক শর্ট নিয়ে আমি আজীবন কাজ করতে রাজী আছি। রাত দশটা পর্যন্ত থাকতে হয় তাও স্বীকার। কিন্তু এই বুড়োকে আপনি সরিয়ে নিন। দুষ্ট গরুর চেয়ে আমারশূন্য গোয়াল ভালো।'

পরিমলবাবুকে যেতে বলে মাস্টারমশাইকে ডেকে পাঠালাম। তাঁর মুখও থম থম করছে।

বললাম, 'ব্যাপার কি মাস্টারমশাই? পরিমলবাবুর সঙ্গে নাকি আপনি ঝগড়া করছেন।'

মাস্টারমশাই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ঝগড়া? ওকে যে বেতিয়ে পিঠ লাল করে দিইনি আমি সেই ওর'

—বাধা দিয়ে বললাম, 'থামুন থামুন। করেছেন কি তিনি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'প্রথম তো, এক লাইনও ইংরেজী লিখতে পারবে না। একটা সেন্‌টেন্‌সে দুটো বানান ভুল, তিনটে গ্রাম্যাটিক্যাল মিসটেক। শুধরে দিলেও শুনবে না, কেবল উড়ো তর্ক।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'বেশ, লিখছে লিখুক ভুল ইংরেজী। তা না হয় নাই ধরলাম। কিন্তু ছেলের বয়সী সব ছোকরা। তাদের সঙ্গে প্রকাশ্য অফিসের মধ্যে এসব কি ইয়ার্কি। ভদ্রঘরের মেয়েদের কথা নিয়ে, সিনেমা স্টারদের নিয়ে এমনকি ব্রথেলের—। ছি ছি ছি। এ সব তুমি সহ্য করতে বল নিরুপম?'

আদিরসে পরিমলবাবুর একটু বেশি আসক্তি আছে। আট ন' ঘণ্টা কলম পিষে পিষে অন্তরাত্মা যখন শুকিয়ে আসে, ঝিমিয়ে আসে, অল্প বয়সী কেরানীর দল তখন স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত ব্যাঙ্কে নানা ধরণের মেয়েদের প্রসঙ্গ আর যৌনজীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে তিনি নিজের এবং সহকর্মীদের কলম মন দুইই রসাপ্লুত করেন। এ খবরটা আমি জানি। কিন্তু পরিমলবাবু কাজকর্মে ভারি দক্ষ লোক। ক্লিয়ারিং মেলাতে ওঁর মত যোগ্যতা আর কারো নেই ব্যাঙ্কে।

মাস্টারমশাইকে বললাম, 'এখানে সবাই কলীগ। অত বাদ-বিচার'—

মাস্টারমশাই তেমনি তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'কলীগ, তাই বলে স্থানকালপাত্র ভেদ নেই? অশ্লীল অশ্রাব্য আলোচনায় ছেলের বয়সী ছাত্রের বয়সী

সব ছোকরাদের মাথা চিবিয়ে খেতে হবে? ফের যদি পরিমলবাবুর মুখে আমি এই সব কুৎসিত কথা শুনি, আমি থাপ্পড় মেরে গাল ভেঙ্গে দেব। হাতাহাতি হয়ে যাবে আমার সঙ্গে'।

গম্ভীরভাবে বললাম, 'আচ্ছা যান। আমি এর ব্যবস্থা করব।'

সেইদিনই মাস্টারমশাইকে স্থানান্তরিত করলাম বিল ডিপার্টমেণ্টে। পরিমলবাবু থেকে তাঁর অল্পবয়সী সহকারীরা সবাই খুশি।

'বাঁচিয়েছেন নিরুপমবাবু। আর এক সপ্তাহ মাস্টারমশাইর সঙ্গে থাকলে আমরা পাগল হয়ে যেতাম। লোক আপনি পারেন দেবেন, না পারেন না দেবেন, কিন্তু মাস্টার-টাস্টার আর পাঠাবেন না।'

কিন্তু দিন পাঁচ ছয়ও কাটল না। বিলডিপার্টমেণ্টেও ফের গোলমাল উঠল। বিলের ইনচার্জ ননীবাবু এসে গম্ভীর মুখে নালিশ করলেন, 'মাস্টারমশাইকে সরিয়ে নিন। ওঁর দ্বারা আমার কাজ চলবে না।'

মাস্টারমশাই নামটা এরই মধ্যে সমস্ত ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে পড়েছে।

বললাম, 'কি হয়েছে ননীবাবু।'

'আরে মশাই, নিজে কাজকর্ম কিছু বুঝবেন না, বুঝতে চেষ্টা করবেন না। কেবল আমার দোষ ধরবেন। কার দ্বারা কতটুকু কাজ হয় না হয়, আমি জানি, আমি বুঝি। ডিপার্টমেণ্টের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারে উনি কেন মাথা গলাতে আসেন বলেন তো। ওঁর সঙ্গে কাজ করা impossible, বিল থেকে হয় ওঁকে আপনি সরিয়ে নিন, না হয় আমাকে সরান। আপনি যদি কোন ব্যবস্থা না করেন, আমি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করব।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'আচ্ছা দেখছি।' মাস্টারমশাইকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম, 'ব্যাপার কি, আপনার নামে ফের কমপ্লেন এসেছে।'

তিনি বললেন, 'কমপ্লেন? আমি ননীবাবুর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করছি। মানুষ না ব্রুট।'

বললাম, 'ব্যাপারটা কি ।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'ব্যাপার কি আর। ক্লিক, কেবল ক্লিক। জন পাঁচেক মাত্র লোক ডিপার্টমেন্টে। তার মধ্যে দুটো ক্লিক। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে ইনচার্জের কাছে। কিন্তু ননীবাবু তো হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট। তাঁর তো উচিত নিরপেক্ষ থাকা, সুবিচার করা। কিন্তু পক্ষপাত তাঁরই সব চেয়ে বেশি। নির্মল বলে একটি ছেলে আছে। সবে ম্যাট্রিক পাশ করে আই, কম এ ভর্তি হয়েছে। ছেলেটি একটু স্পষ্ট বক্তা। সেই জন্য ননীবাবুর যত আক্রোশ তাঁর ওপর।'

বললাম, 'তা থাক, আপনি ওর ভিতরে না গেলেই তো পারেন।'

মাস্টারমশাই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'বল কি তুমি? না গেলেই পারি? আমার চোখের সামনে ছেলেটাকে এমন ক'রে নির্যাতন করবে আর আমি কোন কথা বলব না? পাঁচটার মিনিট কয়েক আগে থেকে ননীবাবু এমন ক'রে কাজ চাপাবেন ওর ঘাড়ে যে সপ্তাহে ছেলেটির চার পাঁচ দিন কলেজ কামাই হয়। এইতো একরত্তি ছেলে, খাটাতে খাটাতে ওর জিভ বের করে ফেলেছেন ননীবাবু। কথা না বলে কোন মানুষে পারে?'

বললাম, 'ননীবাবু জেনারেল ম্যানেজারের নিজের ভাগ্নে। তিনি যদি কোন রিপোর্ট টিপোর্ট করেন তাহলে কিন্তু শত চেষ্টা ক'রেও আমি আপনার চাকরি রাখতে পারব না মাস্টারমশাই, মাস্টারীর মায়া যখন ছেড়েছেন একেবারে ছাড়ুন। অফিসে এসে আর কক্ষণো মাস্টারী করবেন না মাস্টারমশাই।'

আমার শাসনের ভঙ্গিতে মাস্টারমশাই বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন, 'না বাবা দোহাই তোমার, চাকরি টাকরির যেন কোন গোলমাল না হয়। তুমি বরং ননীবাবুকে আমার হয়ে।—আচ্ছা আমিও না হয় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব।'

বললাম, 'ক্ষমা চাওয়ার হয় ত দরকার হবে না, কিন্তু খুব সমঝে চলবেন।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'আচ্ছা নিরুপম তাই চলব। কিন্তু খবরদার, তুমি যেন আমার বাসায় গিয়ে অফিসের এসব গোলমালের কথা বল না বাবা। গীতার মা শুনলে—।'

হেসে মাস্টারমশাইকে অভয় দিয়ে বললাম, 'না, তিনি এসব জানতে পারবেন না।'

কিন্তু দু'দিন বাদে ফের মাস্টারমশাইর নামে ননীবাবু অভিযোগ করলেন। তিনি ফের ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেছেন। তাঁকে নিয়ে কাজ করা অসম্ভব।

সুতরাং আবারও অন্য ডিপার্টমেণ্টে বদলী করতে হোল মাস্টারমশাইকে।

মাস্টারমশাই মুখ ভার ক'রে বললেন, 'বারবার তুমি আমারই দোষ দেখছ নিরুপম। শাস্তি দিয়ে আমাকেই সরাচ্ছ।'

বললাম, 'তা ঠিক নয় মাস্টারমশাই, কিন্তু অফিসের একটা ডিসিপ্লিন আমাকে মেনে চলতে হবে। ননীবাবু এখানকার পুরোন লোক আর খুব এফিসিয়েণ্ট হাণ্ড। তা'ছাড়া জেনারেল ম্যানেজারের—।'

মাস দুয়েকের মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেণ্টই মাস্টারমশাইকে ঘুরিয়ে আনলাম। লেজার, লোন, ফিক্স-ডিপজিট, এ্যাকাউণ্টস, ডেসপ্যাচ—কোন বিভাগই বাদ রইল না, কিন্তু সব জায়গা থেকে অভিযোগ আসতে লাগল। মাস্টারমশাই সর্বত্রই অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি 'কেঅস' সৃষ্টি করছেন অফিসে। তাঁকে নিয়ে কাজ করা অসম্ভব। কর্তৃপক্ষের কাছেও তাঁর নামে রোজ নানা ধরণের অভিযোগ যেতে শুরু করল।

ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মাস্টারমশাইর চাকরি বুঝি আর রাখা গেল না।

এর মধ্যে একদিন তাঁর বাসায়ও গেলাম। খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন মাস্টারমশাইরই স্ত্রী। নানারকম তরকারি রেঁধে পাতের চার ধারে সাজিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'উনি কেমন কাজকর্ম করছেন নিরুপম।'

আশায় উৎসুক তাঁর দুটি চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফের ভাত মাখতে মাখতে মুখ নিচু করে জবাব দিয়েছিলাম, 'ভালোই।'

তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল স্বরে বলেছিলেন 'কেমন বলিনি গীতা? ইচ্ছা করলেই উনি পারবেন।'

গীতা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল 'বাঃ রে, পারবেন না আমি বলেছি নাকি?'

কিন্তু ডেসপ্যাচ থেকেও যখন ক্রমাগত অভিযোগ আসতে লাগল আমি মাস্টারমশাইকে ডেকে বললাম, 'কেয়ার-টেকার প্রফুল্লবাবু কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, আপনি তাঁর জায়গায় কাজ করুন, বেয়ারাদের দেখা শোনা করবেন।'

মাস্টারমশাই অভিমানের সুরে বললেন, 'সমস্ত না শুনে, না জেনে বার বার তুমি আমাকেই জব্দ করছ নিরুপম। ডেসপ্যাচার ভুবনবাবু সেদিন কানাই বেয়ারাকে সামান্য কারণে যেভাবে গালাগালি করেছিলেন তা কোন ভদ্রলোক করে না, কোন ভদ্রলোক তা সইতেও পারে না, আমি আপত্তি করেছিলাম, তাই বুঝি তিনি এসে লাগিয়েছেন?'

বললাম, 'সে যাক, আপনি আজ থেকে বেয়ারাদের ভার নিন। ওরা কখন আসে যায় লক্ষ্য রাখবেন, যে ডিপার্টমেন্টে যে কজন বেয়ারার দরকার হয় ঠিক মত হিসাব করে দেবেন। দেখবেন কেউ যেন কাজে ফাঁকি না দেয়, চুপচাপ বসে না থাকে। এই হোল মোটামুটি কাজ। বোধ হয় এতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।'

রাগে অভিমানে মাস্টারমশাই যেন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপর বললেন, 'তার মানে তুমি আমাকে অপমান করছ। তার মানে বেয়ারাদের সর্দারি করা ছাড়া আর কোন কাজের যোগ্য বলে তুমি আমাকে মনে করছ না।'

বিরক্ত হয়ে ফাইল থেকে মাথা তুলে বললাম, 'কি মনে করছি, না করছি

সে সব আলোচনা পরে আর এক সময় করব মাস্টারমশাই। আপাততঃ আমি ভারি ব্যস্ত।'

মাস্টারমশাই বেরিয়ে গেলেন।

প্রথম দিনকয়েক বেয়ারাদের কাছ থেকেও অভিযোগ আসতে লাগল, মাস্টারমশাই বড় রূঢ়ভাষী। হাজিরা সম্বন্ধে ভারি কড়াকড়ি তাঁর! চাল চলন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ভারি খুঁতখুতি। একদিন নাকি কি একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলার জন্য শীতলকে চড় মেরেছিলেন।

কিন্তু সপ্তাহ দুই বাদে অভিযোগের ধরণগুলি অন্য রকম হতে শুরু করল। মাস্টারমশাই বেয়ারাদের হয়ে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। কোনো বেয়ারাকে একটু কড়া কথা বলবার উপায় নেই মাস্টারমশাই তেড়ে এসে প্রতিবাদ করবেন। কোনো ব্যক্তিগত কাজকর্মে তাদের পাঠানো চলবে না। মাস্টারমশাই বলেন 'তা হলে অফিসের কাজ সাফার করে। বাবুদের কেবল পান সিগারেট জোগাবার জন্য ওদের রাখা হয় নি।'

ক্লিয়ারিং-এর পরিমলবাবু এসে একদিন বললেন, 'ভালো চান তো বেয়ারাদের সর্দারী থেকে এখানো মাস্টারমশাইকে সরিয়ে আনুন, আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওদের উনি মাথায় তুলে ছাড়বেন।'

বললাম, 'আচ্ছা যান। দেখছি।'

ইয়ার ক্লোজিং-এর সময় কাজ সারতে সারতে রাত প্রায় আটটা হোল। অফিসের আর সব ডিপার্টমেণ্ট চলে গেছে। নিজের ডিপার্টমেণ্টের দু'জন সহকর্মীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা যেতেই মনে পড়ল দেরাজটা চাবিবন্ধ করে আসিনি। কতকগুলি জরুরী চিঠি টেবিলেই পড়ে আছে। সহকর্মীদের ছেড়ে দিয়ে আমি ফের এসে ঢুকলাম অফিসে। গেটের কাছে দারোয়ান খৈনি টিপছে মাথা নিচু ক'রে সেলাম জানাল।

দেরাজে চাবি বন্ধ করে ফিরে আসছি: হঠাৎ লক্ষ্য করলাম অফিসের

পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি আলো জলছে। মৃদু আলাপ শোনা যাচ্ছে জনকয়েকের, বেয়ারাদের জন কয়েক অফিস বিল্ডিং-এই রাত্রে থাকে। ছাতের ওপর রান্না-বান্না করে, খায় দায়। ভাবলাম তারাই আড্ডা দিচ্ছে।

ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ কানে গেল, 'আচ্ছা স্বাধীনতা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ জানো তোমরা?' একি এ যে মাস্টারমশাইর গলা। এত রাত্রে মাস্টারমশাই কি করছেন এখানে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম সাত আটটা ছোট ছোট টুল পেতে শীতল, বিপিন, নিবারণ, কানাই এবং আরও কয়েকজন মাস্টারমশাইকে প্রায় ঘিরে বসেছে। ডেসপ্যাচারের চেয়ারটায় বসেছেন মাস্টারমশাই। সবাইকে ছাড়িয়ে কাঁচা পাকা চুলে ভর্তি তাঁর মাথাটা উঁচু হয়ে উঠেছে। বেয়ারাদের কারো হাতে খাতা পেন্সিল, ব্যাঙ্কেরই সব বাতিল কাগজপত্র। কারো হাতে খড়ি আর শ্লেট। আমাকে দেখেই মাস্টারমশাই আর ছাত্রের দল সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

মুহূর্তকাল আমিও কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, এসব কি হচ্ছে মাস্টারমশাই। ক্লাস নিচ্ছেন নাকি?

মাস্টারমশাই অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর মত উঠে দাঁড়ালেন, 'না না ক্লাস টাস কিছু নয়। অমনিই ওদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। অফিস ডিসিপ্লিনটা ভালো ক'রে আয়ত্ব করানোই অবশ্য আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্য আক্ষরিক শিক্ষাটাও কিছু কিছু দরকার, কি বল?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

মাস্টারমশাই বললেন, 'এদের মধ্যে একটি ছেলে কিন্তু অদ্ভুত মেরিটরিয়াস। আমাদের এই কানাই, চেন ওকে?' বার তের বছরের কালো, রোগাপানা একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চিনি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'অদ্ভুত মাথা। ইংরাজী বল, অঙ্ক বল, সব বিষয়ে

সমান উৎসাহ। এই সব ছেলেকে দিয়েই স্কলার-শিপের এ্যাটেম্পট নিতে হয়। প্রায়ই ক্লাস সিক্সের স্ট্যাণ্ডার্ডে আছে। জানো, খানিকটা কেয়ার নিতে পারলে ওকেও ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফার্স্ট ক'রে তোলা যায়।'

বেরিয়ে আসছিলাম, দেখি মাস্টারমশাই আমার পিছনে পিছনে এসেছেন। আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাস্টারমশাই বললেন, 'চল, আমিও যাচ্ছি, একটা request নিরুপম, এসব কথা যেন গীতার মা, কি জেনারেল ম্যানেজারের কানে না যায়।'

মনে মনে হাসলাম, প্রথম মাস্টারীও মাস্টারমশাই এমনি লুকোচুরির ভিতরেই শুরু করেছিলেন।

হেডমিস্ট্রেস

সকালের চায়ের পাট শেষ করে তক্তপোষে সাড়ম্বরে শুয়ে সিগারেট মুখে খবরের কাগজে চোখ আর চার বছরের মেয়ে মিন্টুর পিঠে সস্নেহে হাত বুলাচ্ছিল শৈলেন। হঠাৎ কানে এল "না, অর্চনা মিত্তিরটা একেবারেই যা তা। যাই বল। কেবল স্টাইল আর পোষাক-আসাকের দিকেই লক্ষ্য। পড়াশুনার ধারেও ঘেঁষবে না। ইংরাজীতে এবারও ফেল করল।"

কাগজ থেকে মুখ তুলে শৈলেন স্ত্রীর দিকে তাকাল। একটু দূরে জানালার কাছে টুলটা টেনে নিয়ে সুপ্রীতি খাতা দেখছে। ফার্স্ট ক্লাসের খাতা ক'খানা এখনই দেখে শেষ করা চাই। পুজো উপলক্ষে আজ বন্ধ হয়ে যাবে স্কুল।

শৈলেন একটু হাসল, 'ফেল করল, আহা হা বেচারা। কেউ ফেল করেছে শুনলে বড় দুঃখ লাগে। দাওনা ওকে কটা নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে।'

সুপ্রীতি খাতা থেকে মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল। শ্যামবর্ণের ওপর মুখখানা বেশ সুন্দর। চোখ দুটি বড়, লম্বা নাকটি একটু বাঁকানো, পাতলা ঠোঁট, কোমল চিবুক, হাসলে টোল পড়ে।

সুপ্রীতি কিন্তু হাসল না, জোড়া ভ্রূ কুঁচকে, স্বামীর দিকে চেয়ে রুক্ষ স্বরে বলল, 'তার মানে?'

শৈলেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফের একটু হাসল, 'মানে আর কি। টাকা তো নয়, গোটা কয়েক নম্বরই তো। বাক্স থেকে তো আর বের করে দিতে হবে না। রঙীন পেনসিলে অকৃপণ হাতে কোন এক জায়গায় বসিয়ে দিলেই চলবে। তাই দাও, মেয়েটা খুশি হোক।' নিজের মনটা ভারি খুশি রয়েছে আজ শৈলেনের। যদিও খুশি হওয়ার বিশেষ কারণ নেই। অফিস থেকে এবার আর বোনাস দেবে না; মাসের মাইনেটি প্রথম দশ দিনের

মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবু আজ অফিস ছুটি। ভোর থেকে শীত শীত হাওয়া দিচ্ছে। আকাশে বাতাসে শারদীয় ভাব। শহরতলীর পাশাপাশি ছুটো রাস্তায় লাল কাপড়ে সার্বজনীন পুজোর সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আর জানালার বাইরে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ একটি নীল অপরাজিতা চোখে পড়েছে শৈলেনের। কৈশোরের আর প্রথম যৌবনের অনেকগুলি দিন রাত সেই রঙ মেখে স্মৃতির দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে। অবশ্য কেবল রঙীন স্মৃতিই নয় তার নেপথ্যে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতিও আছে। সুপ্রীতি আজ দু'মাসের মাইনে পাবে। শৈলেন ভেবেছিল ভোরে উঠে বলবে "শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে একটু গাওনা প্রীতি", কিন্তু বলতে সাহস হয়নি। দক্ষিণ সিঁথি বিদ্যাবীথির হেডমিস্ট্রেস শ্রীযুক্তা সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় গভীর মনোযোগ আর গম্ভীর মুখভঙ্গীর সহযোগে ছাত্রীদের ইংরেজী জ্ঞানের পরীক্ষা নিচ্ছেন। দেশী সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ সারির সাধারণ একটি কেরাণীর কোন চাপল্য দেখলে তিনি হয়তো বেত তুলতেও পারেন.

স্বামীর কথা শুনে সুপ্রীতি অবশ্য বেত তুলল না, কিন্তু মুখখানাকে আরও কঠিন, গলার স্বরটিকে আরও রুক্ষ করে তুলল, 'তোমার সবই ঠাট্টা, না? স্কুলের পরীক্ষাটা বুঝি আর পরীক্ষা নয়? কোন রকম দায়িত্ব তার নেই। শুধু চোখ বুজে নম্বর বসিয়ে গেলেই হল, তাই বুঝি ভাব তুমি?'

রীতিমত হেডমিস্ট্রেসসুলভ ধমক। এর উত্তরে শৈলেন হাসতে পারত, অন্যদিন হাসেও, কিন্তু আজ তার হাসি পেল না। তার বদলে মিণ্টুই হেসে উঠল, 'কি মজা। বাবাকে বকো মা, আরো বকো। আমাকে নতুন জুতো কিনে দিলে না। কেবল বলে দেব দেব, কোন দিন দেয় না।'

সুপ্রীতি মেয়েকে ধমক দিল, 'এই চুপ।' তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'এইতো কাল রাত থেকে বলছি, ক'খানা খাতা দেখে দাও। কাজ-কর্ম তো নেই। অফিস থেকে এসে চুপ চাপ বসে বসেই তো সন্ধ্যা থেকে

রাত দশটা অবধি কাটিয়ে দিলে। আজও সকাল থেকে বসে আছ তো আছই। কেন দু'খানা খাতা দেখলে, নম্বরগুলি টোটাল দিলে কি জাত যায় ?'—

শৈলেন কাত হয়ে ছিল, এবার উঠে সোজা হয়ে বলল, 'আলবৎ যায়। তোমার খাতা দেখে দেওয়াটা কি আমার চাকরি নাকি ?'

সুপ্রীতি কঠিন কণ্ঠে বলল, 'তাতো নয়ই। কিন্তু তোমার অফিসের সময় জুতোয় কালি আর জামায় বোতামগুলি রইল কিনা, তা লক্ষ্য করা, দেরাজের চাবি আর জরুরী কাগজপত্র গুছিয়ে পকেটে গুঁজে দেওয়া নিশ্চয়ই আমার চাকরি, কি বল ?' খাতার পাতায় চোখ নামাল সুপ্রীতি। নীল পেনসিল দিয়ে অর্চনা মিত্রের আরো কতকগুলি ব্যাকরণের ভুল কেটে ফেলল। দাগের দৈর্ঘ্য আর গভীরতা দেখে ওর রাগের তীব্রতাটা টের পাওয়া গেল।

আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল শৈলেন। আশ্চর্য যে সেবা পরিচর্যাটুকু নিতান্তই ভালোবাসার দান, দৈনন্দিন দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে যা একান্ত স্বাভাবিকভাবেই মিশে রয়েছে, আজকাল তা নিয়েও খোঁটা দেয় সুপ্রীতি, তারও চুলচেরা হিসাব করতে চায়। তার কারণ ওর আর্থিক ক্ষমতা হয়েছে। সংসারে অর্থমূল্যই যে পরম মূল্য তা টের পেয়েছে সুপ্রীতি।

গোড়ার দিকে শৈলেন নিজেই ওর স্কুলের পরীক্ষার খাতাগুলি টেনে নিত, বলত, 'দাও আমি দেখে দিচ্ছি। খাতা প্রতি দু'আনা করে কিন্তু দিতে হবে, সিগারেটের খরচা বাবদ।' সুপ্রীতি হেসে বলত, 'ওরে বাবা আমার গরীব স্কুল। তোমার শ্বেত হস্তীর খরচ জোগাবে কি ক'রে। দু'টো খাতা আর একটা সিগারেট, এই চুক্তি কেমন ?'

শৈলেন সেই সর্তেই রাজী হয়ে যেত। কিন্তু একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে তার দেখা খাতা স্ক্রুটিনাইজ করতে বসেছে সুপ্রীতি। এদিকে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে মিণ্টুর, উনানে তরকারী পুড়ছে।

শৈলেন বলেছিল, 'খাতাগুলি তো আমি দেখেই রেখেছি। আবার দেখছ কি ?'

সুপ্রীতি একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি খাতাগুলি আঁচলের তলায় লুকিয়েছিল। যেন গোপনে লেখা কবিতার খাতা, কি প্রেমপত্র। তারপর স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিয়েছিল, 'এ্যানুয়ালের খাতা কিনা। তাই একটু ভালো ক'রে দেখছিলাম নম্বর টম্বর ঠিক আছে কিনা। গোলমাল হলে লজ্জায় পড়তে হবে।'

'কেন গোলমাল কিছু দেখলে না কি ?'

সুপ্রীতি মুখ টিপে হেসেছিল, 'তা একটু আধটু দেখলাম বইকি। তুমি তো আর seriously দেখনি। বেশির ভাগই আন্দাজী কারবার।' তারপর সুপ্রীতি মুখ তুলে তাকিয়েছিল স্বামীর দিকে, 'অবশ্য দোষটা কেবল তোমার নয়, মেয়েদের স্কুল বলে কেউ seriously নেয় না। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী পর্যন্ত এটাকে একটা ছেলেখেলা বলেই ভাবেন। কেবল মেয়েদের শিক্ষাই বা বলি কেন, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাই তো তাই। যেহেতু লেখাপড়াটা অল্প বয়সে শিখতে হয়, তোমরা এটাকে অল্প দামী ছেলে ভুলাবার জিনিস ছাড়া কিছু ভাবতে পার না।'

তোমরা—

শৈলেন বাধা দিয়ে বলেছিল, 'দোহাই লক্ষীটি, এমন চমৎকার বক্তৃতাটি টিচার্স কনফারেন্সের জন্য তুলে রাখ। অফিস থেকে খেটে খুটে এলাম এবার একটু চা চাই।'

তারপর থেকে সুপ্রীতির খাতা আর শৈলেন দেখে না। একটু মজা, একটু অবসর বিনোদনের ভাব শৈলেনের মনে ছিল বই কি ! সমস্ত জীবনটাই যখন কাজে ভরতি তখন কোন কোন কাজ কারো কারো কাজ নিয়ে এক আধটু খেলতে ইচ্ছা তো হয়ই। আর খেলার মাঠে সাধ হয় কাজের লোক হ'তে।

'আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

কিন্তু সুপ্রীতি তার স্কুল নিয়ে খেলা ভালোবাসে না। কোন রকম চাপল্য সহ্য করে না ও। মাত্র বছর দেড়েকের চাকরিতে মাষ্টারনীর মুখোশ ওর মুখে শক্ত হয়ে আটকে বসেছে। সে মুখোশ ও কথনো যেন খুলতে চায় না, না কি চাইলেও পেরে ওঠে না। ওর ছাত্রী পড়ানো গম্ভীর মুখে আদর ক'রে চুমো খেতে মাঝে মাঝে দ্বিধা হয় শৈলেনের, ভয় হয়। সে চুম্বন হয়তো ওর মুখোশে ঠেকে যাবে, মুখ স্পর্শ করবে না।

মাঝে মাঝে শৈলেন ভাবে এই মাস্টারীর চাকরি থেকে স্ত্রীকে ছাড়িয়ে আনবে, ওর স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে কষ্ট হয়, আরো কষ্ট হয় ওর গলার স্বর, মুখের লাবণ্য বদলে যাচ্ছে দেখে। পেশার ছাপ পড়ে যাচ্ছে ওর চেহারায়, সে ছাপ দিনের পর দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কিন্তু এই সৌন্দর্যপ্রীতি বেশীক্ষণ মনে ঠাঁই পায় না। সুপ্রীতির উপার্জন আজ সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। শ্যামবাজারে আছে একান্নবর্তী পরিবারের আর এক ভগ্নাংশ। দাদা, বৌদি, ভাইপো, ভাইঝির দল। কেউ বেকার, কেউ অর্ধবেকার—টিউশনি সম্বল। তারা এসে হাত পাতে। কারো কলেজের মাইনে বাকি। কারো চিকিৎসার খরচ জোটে না। কোন সপ্তাহে বা থাকে না রেশনের টাকার সংস্থান।

শৈলেন মুখ ঝামটা দেয়, আমি কি করব?

তবু করতে হয়, না করলে এখনো মন খুঁত খুঁত করে।

আর সেই সুযোগে সুপ্রীতি দিনের পর দিন ঘরে বাইরে হেড মিস্ট্রেস হয়ে ওঠে। দুঃসহ! সিগারেটের টুকরোটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল শৈলেন। কিন্তু শিকে ঠেকে জলন্ত টুকরোটা ফিরে এসে পড়ল ট্রাঙ্কের ঢাকনির ওপর। সুপ্রীতির নিজের হাতে তৈয়ারী লতা আঁকা ঢাকনি পুড়তে লাগল। পুড়ুক।

মিণ্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'আগুন লাগল, মা আগুন লাগল।'

পোড়া গন্ধ ততক্ষণ সুপ্রীতিরও নাকে গেছে। খাতা ফেলে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, 'হচ্ছে কি সব শুনি? সবাইকে পুড়িয়ে মারবার ইচ্ছা বুঝি।'

সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুপ্রীতি স্বামীর দিকে তাকাল। সিগারেটের আগুন ততক্ষণ নিভে গেছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর দুজোড়া চোখ অনন্তকাল ধ'রে জলছে তো জলছেই। একটু বাদে সুপ্রীতি ফের তার জল-চৌকিখানার ওপর গিয়ে বসল। আর শৈলেন গেল আলনার কাছে। জামা চড়াল গায়ে। কোথাও বেরিয়ে পড়বে বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে।

কিন্তু বেরুবার জো নেই। রান্নাঘর থেকে ঝি রাসমণি এসে থলি হাতে সামনে দাঁড়াল, 'দাদাবাবু বাজারে যান।'

বিদ্যাবীথির ঝি রাসমণি। সংসারে আর কেউ নেই। খোরাকীর বদলে হেডমিস্ট্রেসের বাসায় কাজ করে। সুপ্রীতি ব্যস্ত থাকলে মাঝে মাঝে রেঁধেও দেয়। স্কুলের সেক্রেটারী অনুকূল সরকারই ঠিক ক'রে দিয়েছেন।

'বিনা মাইনেয় এমন কম্বাইন্‌ড্‌ হ্যাণ্ড আর কোথাও পাবেন না শৈলেন-বাবু। জানেন তো আজকালকার দিন, বউ পাওয়া বরং সহজ, কিন্তু সহর ভ'রে খুঁজলেও পছন্দসই একটি ঝি জোগাড় করতে পারবেন না।'

প্রৌঢ় অনুকূলবাবু একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন।

রাসমণির কথায় শৈলেন জবাব দিল, 'আজ আর বাজার হবে না। আমার কাজ আছে।'

রাসমণি অবাক হ'য়ে বলল, 'ওমা সে কি, বাজার না হলে খাবেন কি, ঘরে কি এক রত্তি তরকারিও আছে। তেমন গেরস্থ নাকি আপনারা, যে কিছু জমিয়ে রাখবেন? ভাঁড়ার সব ধোয়া মোছা। যান শিগগির বাজারে যান, আমার উনুন বয়ে গেল।'

থলিটা হাতে গুঁজে দিতে এল রাসমণি।

কিন্তু দু'পা পিছিয়ে গেল শৈলেন, রুক্ষ স্বরে বলল, 'বলছি তো পারব না। দরকার থাকে নিজে বাজার ক'রে নিয়ে এসো।'

রাসমণি নিজের থুতনিতে আঙুল দিয়ে বলল, 'কি আহ্লাদে কথা রে। দুবেলা দু' মুঠি ভাতের বদলে আমি বাসন মাজব, রাঁধব আবার মেয়ে মানুষ হয়ে বাজারও করব? ভাবলেন কি আপনারা? যান্ আর দিক করবেন না। আমাকে কোন রকমে দুটি নামিয়ে রেখেই আবার ইস্কুলের কাজে বেরুতে হবে।'

কেবল স্কুলের কাজ আর স্কুলের কাজ। বউ আর ঝি দুজনের মুখে একই কথা।

শৈলেন রাগ করে বলল, 'কাল থেকে বাসার কাজ আর তোমাকে করতে হবে না। শুধু স্কুলের কাজই কোর।'

এবার রাসমণি হাসল। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হয়েছে। অল্প বয়সের বিধবা। সন্তানাদি কিছু হয়নি। এখনো বেশ আঁট-সাঁট চেহারা। ভরাট মুখ। পরণে সরু চুল পেড়ে ধুতী। মাথায় কালো মিশমিশে চুল আছে এক গোছা। রঙটা ফর্সাপানা। পান দোক্তায় ভরা মুখ। হাসলে কোন কোন সময় এখনো রাসমণিকে ভালোই দেখায়। কিন্তু এখনকার হাসিতে শৈলেনের চিত্ত জ্বলে গেল। রীতিমত অবজ্ঞার হাসি ঝিটার মুখে। ও জানে শৈলেন ওকে কাজে বহালও করেনি, ওকে ছাড়িয়ে দেওয়ার শক্তিও তার নেই। কোয়ার্টারটা স্কুলের। স্বয়ং সেক্রেটারী হেডমিস্ট্রেসের সেবা পরিচর্যার জন্য তাকে এখানে রেখেছেন। শৈলেন কথা বলবার কে।

রাসমণি সুপ্রীতির দিকে এবার ফিরে তাকাল, 'ও বড় দিদিমণি, বলি খাতা তো দেখছেন, এদিকে যে বাজার হয় না। সোয়ামীর সঙ্গে ফের বুঝি এক চোট হয়ে গেছে? ঝগড়া করবেন আপনারা, আর তার ফল ভুগবে আর মানুষে। মজা মন্দ নয়। এত ঝগড়া লাগে কিসে আপনাদের?'

সুপ্রীতি রাসমণির দিকে তাকিয়ে এবার হাসল, 'তুই থামতো। বাজার না হয়, ডাল ভাত হবে আজ।'

মিন্টু বলে উঠল, 'আমি কিন্তু ডাল খাব না মা। বাবা ইলিস মাছ আনবে, তাই খাব।'

সুপ্রীতি কি বলতে যাচ্ছিল, সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল, 'শৈলেনবাবু আছেন নাকি, ও শৈলেনবাবু ?'

সেক্রেটারী অনুকূল সরকারের গলা, শৈলেনের নাম ধ'রে ডাকলেও তিনি এসেছেন হেডমিস্ট্রেস সুপ্রীতি মুখুয্যের কাছে। গৃহস্বামীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, বিশেষ কোন কথাও নেই। স্কুলের দরোয়ান ভজন সিং-এর মত শৈলেনও এই হেডমিস্ট্রেসের [illegible] দ্বাররক্ষী মাত্র, আর কিছু নয়। মনে মনে সেক্রেটারীর ওপর অত্যন্ত বিদ্বেষ বোধ করল শৈলেন। ভাবল আজ লোকটির মুখের সামনে দোর বন্ধ ক'রে দেয়।

কিন্তু রাসমণি তাকে ততক্ষণে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে, 'আসুন, বড়বাবু, দোর খোলাই আছে।'

ময়লা শাড়ি পরা ছিল সুপ্রীতির। একটা জায়গায় একটু ছেঁড়াও আছে। আড়ালে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানা বদলে ফিকে হলদে রঙের পরিষ্কার শাড়িখানা পরে নিয়ে পাশের ঘরের দিকে চলল। ছোট্ট একটু বসবার ঘর আছে লাগাও। সেক্রেটারী চট ক'রে এদের শোয়ার ঘরে ঢোকেন না। ছোট ঘরে ছোট টেবিলের সামনে গিয়েই বসেন। হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দরকারী কথাবার্তা শেষ ক'রে অনেক সময় সেখান থেকেই চলে যান।

শৈলেন স্ত্রীকে কাঁপা গলায় বলল, 'কেবল কি শাড়ি বদলালেই হবে। মুখে পাউডারের পাফটা একটু বুলিয়ে নেবেনা ? গলায় সরু হার ছড়াও পড়ে নাও, বেশ দেখাবে।'

[illegible] দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সুপ্রীতি বলল, 'ইতর কোথাকার।'

তারপর সোজা চলে গেল সেক্রেটারীর ঘরে।

রাসমণি ফের এসে তাগিদ লাগাল, 'আর দেরি করবেন না, দাদাবাবু। উনুন জ্বলে গেল। মাস অন্তে আপনিই তো শেষে কয়লার হিসাব করেন। এত লাগে, অত লাগে। কেন লাগে এবার বুঝে দেখুন।'

উপায় নেই। মনে যত বিক্ষোভই থাকুক, দিনযাত্রার এতটুকু ব্যত্যয় হ'লে চলবে না। থলি হাতে ঘর থেকে বেরুল শৈলেন। রাসমণি বলল, 'মাছ, পান, তরকারী, আর শুকনো লঙ্কা কিন্তু একেবারেই নেই। মনে থাকে যেন, কালকের মত ভুলে যাবেন না।'

সেক্রেটারীর সঙ্গে স্কুল সংক্রান্ত কথা বলতে বলতে হঠাৎ সুপ্রীতি বলল, 'খয়েরের কথা বললিনে রাসমণি, খয়ের আসে যেন।'

অনুকূলবাবুর গলা শোনা গেল, 'অমন ক'রে পিছন থেকে বললে কি কারো কানে যায় মিসেস মুখার্জি, না মনে থাকে। সামনে ডেকে ভালো করে বলুন। ও শৈলেনবাবু এদিকে আসুন, আরে শুনুন, শুনুন, সিগারেট নিয়ে যান।'

আপ্যায়নে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন অনুকূলবাবু।

স্ত্রীর মনিব। সিগারেট তো তাঁকে শৈলেনেরই খাওয়াবার কথা। কিন্তু সিগারেট আর নেই, আছে বিড়ি। তা তো আর দেওয়া যায় না, কিন্তু সিগারেটটা নিতেও যেন কেমন কেমন লাগে। এত ঘনিষ্ঠতা কিসের অনুকূলবাবুর। দৌবারিককে কেন এই খাতির।

তবু ডেকেছেন যখন, না যাওয়াটা অভদ্রতা। বসবার ঘরের সামনে শৈলেন দাঁড়িয়ে শুকনো একটু হাসল, 'না না, সিগারেট থাক, এই তো, এই মাত্র খেলাম। বড় tedious job, যাই বলুন।'

অনুকূলবাবু হাসলেন, 'কি বাজার করাটা? আপনাদের মত কবি মানুষের পক্ষে সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের বেলায় কথাটা খাটে না। আমাদের তো বাজারেই দিন রাত কাটাতে হয়। তবু সকালের বাজারটি

কিন্তু নিজের হাতে না করলে মন ওঠে না। চাকর বাকর অবশ্য গোটা তিনেক আছে, কিন্তু সব ব্যাটা পকেট কাটা। তা' দুচার আনা ওরা মারে মারুক, তবু যদি পছন্দসই জিনিসটি ঘরে আসে। তা তো আসবে না, ওরা কি জিনিস চেনে? ওদের হাতে বাজার ছেড়ে দিলে সেদিনের খাওয়াটাই মাটি। নিন।' দামী সৌখীন সিগারেট কেসটি বাড়িয়ে ধরলেন অনুকূল-বাবু। অগত্যা একটা গোল্ড ফ্লেক তুলে নিল শৈলেন। কিন্তু আশ্চর্য তেমন যেন স্বাদ নেই গোল্ড ফ্লেকে।

চল্লিশ পেরিয়ে গেছে অনুকূল সরকারের বয়স। কিন্তু বেশ মোটা সোটা শক্ত স্বাস্থ্যবান পুরুষ। ইট শুরকির কারবারে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন যুদ্ধের বাজারে। স্থূল জিনিষপত্র নিয়ে নাড়া চাড়া করলেও রুচিটি সূক্ষ্ম। ওপাড়া থেকে এপাড়ায় আসতে হলেও বেশ সেজেগুজেই বেরোন। পরণে খদ্দরের মিহি ধুতি। সাদা পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম পরানো, হাতে লাল, নীল পাথর বসানো গুটি দুই আংটি। কেবল সাজসজ্জাতেই নয়, সদনুষ্ঠানেও অনুরাগ আছে অনুকূলবাবুর। সিঁথি বিদ্যাবীথি বলতে গেলে তাঁর নিজেরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। কাজকর্মের ফাঁকে যেটুকু অবসর পান স্কুলের উন্নতির জন্য খাটেন। বছর তিন চার হোল স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। তারপর আর বিয়ে করেন নি। স্ত্রী শিক্ষার ওপর অনুকূলবাবুর স্ত্রীর নাকি খুব ঝোঁক ছিল। তাই তাঁরই প্রীতির জন্য এই গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই সঙ্গে অন্নসংস্থান হয়েছে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবারের। টিচারদের মধ্যে বেশির ভাগই মাত্র ম্যাট্রিক পাশ। দু' তিনজন আণ্ডার-ম্যাট্রিকও আছেন। সেকেণ্ড টিচার আই এ। গ্রাজুয়েট শুধু হেড মিস্ট্রেস সুপ্রীতি। এই প্রতিযোগিতার বাজারে অন্য কোন হাই স্কুলে এদের চাকরি জোটা কঠিন হোত। ছাত্রীরাও অধিকাংশই দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। আশে পাশের উদ্বাস্তু ক্যাম্প আর কলোনী থেকেই বেশির ভাগ আসে। অনেককেই অর্ধবেতনের সুবিধা দিতে হয়েছে।

কাউকে কাউকে বিনা মাইনেরও বিদ্যা দান করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে, কিন্তু সরকারী সাহায্য এখনো এসে পৌঁছোয় নি। তার জন্য চেষ্টা চরিত্র চলছে। কেবল এপাড়া নয়, সহর ভরে অনুকূল সরকারের বন্ধুবান্ধব। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়ও ক'জন আছেন। তাঁদের কাছ থেকে স্কুলের জন্য নিয়মিত চাঁদা তুলে আনেন অনুকূলবাবু। ছুটি ছাটায় স্কুলবাড়িকে বিয়ে-বাড়ি হিসাবে ভাড়া দেন। তাতেও কিছু টাকা আসে। আর স্কুলের সুনাম আর ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খাটে সুপ্রীতি নিজে। কেবল ক্লাসে পড়িয়েই তার দায়িত্ব শেষ হয় না, একটি প্রতিষ্ঠানের সে মাথা। তার জন্য সর্বদা তাকে মাথা খাটাতে হয়।

ফিকে হলদে রঙের শাড়ি প'রে পিঠ ভ'রে একরাশ চুল ছড়িয়ে সেক্রেটারীর টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুপ্রীতি। দীর্ঘ তনুদেহ নিনয়ে আনম্র। ভঙ্গিটি অনুরক্তার না হোক, অনুগৃহীতার। মনে মনে হাসল শৈলেন, কোথায় সেই হেডমিস্ট্রেসী প্রতাপ। স্বামীর কাছে না হোক সেক্রেটারীর কাছে তো মাথা নোয়াতে হয়েছে হেডমিস্ট্রেসকে। পুরুষের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে স্ত্রীলোককে। মুহূর্তের জন্য অনুকূল সরকারের সঙ্গে এক ধরণের সান্নিধ্য, অভিন্নতা অনুভব করল শৈলেন।

অনুকূলবাবু বললেন, 'আজই আবার আমাকে একটা সরকারী কাজে দিল্লী যেতে হচ্ছে। তাই ভাবলাম মিসেস মুখার্জির সঙ্গে দেখা ক'রে যাই, আজকে আবার ওঁদের 'পে ডে' কি না', মৃদু হাসলেন অনুকূলবাবু।

ঠিক ঠিক আজ ওদের মাইনের তারিখ। যেতে যেতে ঝুল পকেটে হাত ঢোকাল শৈলেন। মাত্র টাকা দেড়েকের খুচরো আছে সম্বল। এই দিয়েই দিনটাকে বিকেল পর্যন্ত ঠেলে নিতে হবে।

রাস্তার মোড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে দেখা হোল অঙ্কের টিচার অমলা গুপ্তের সঙ্গে। একজন ভদ্রলোকও রয়েছেন পিছনে। হাতে ওষুধের শিশি। ডাক্তারখানা থেকে ফিরছেন। অমলা হেডমিস্ট্রেসের বাসায় মাঝে মাঝে

জানে। শৈলেনের সঙ্গে সুপ্রীতি তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ছোটখাট রোগা, ক্যাঁকালে চেহারা অমলার। তবু ওর মধ্যে মুখশ্রীটুকু মন্দ নয়।

শৈলেনকে দেখে অমলা হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাল, মৃদু হেসে বলল, 'এই যে।'

তারপর পিছনের পুরুষটির দিকে তাকিয়ে শৈলেনের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমাদের হেডমিস্ট্রেসের স্বামী। আর ইনি আমার—'

শৈলেনের দিকে তাকিয়ে ফের একটু হাসল অমলা গুপ্ত।

হেডমিস্ট্রেসের স্বামী এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট টিচারের স্বামীর সঙ্গে নিঃশব্দে নমস্কার বিনিময় করল। কিন্তু কথা বলল অমলার সঙ্গেই, 'ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ, বাজারে চলেছেন বুঝি?'

স্মিত সৌজন্যে মধুর অমলার গলা। শৈলেন জানে তার এ-খাতির সুপ্রীতির জন্যই।

'আপনার কাজের খুব প্রশংসা শুনি।'

শৈলেনের ঠোঁটে মৃদু হাসি, গলায় গ্ল্যাটি-এর সুর। বিশেষ কিছু নয়, সে স্কুলের সেক্রেটারীরই অনুকরণ করছে। শৈলেন সেক্রেটারী না হ'তে পারে, কিন্তু অমলা গুপ্তের কাছে তাদের হেডমিস্ট্রেসের স্বামী।

অমলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'প্রশংসা না আরও কিছু। স্কুলে তো সুপ্রীতি দি ব'কে কাউকে আস্ত রাখেন না। মেয়েরা আর টিচাররা সমান তটস্থ।'

কড়া হেডমিস্ট্রেস বলে একসঙ্গে সুনাম আর দুর্নাম আছে সুপ্রীতির।

শৈলেন মৃদু হাসল, 'তাই না কি? কিন্তু আপনাকে বকা উচিত নয়, তবে আপনি যেমন লাজুক, আর মুখচোরা তাতে দেখলে সকলেরই বোধ হয় একচোট বকে নিতে ইচ্ছা করে। না বকলে কি আপনার মুখে কথা ফোটে।'

অমলার টিচারের স্বামী ততক্ষণে কটমট ক'রে তাকিয়েছে শৈলেনের দিকে।

শৈলেন মৃদু হেসে পকেট থেকে তাঁকে একটি বিড়ি অফার করল, 'নিন।'
ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'আমি বিড়ি খাইনে, আচ্ছা চলি নমস্কার।'
সস্ত্রীক বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

শৈলেন নিজে একটা বিড়ি ধরাল, তারপর মনে মনে বলল, 'না খাও না খেলে। হেডমিস্ট্রেসের স্বামী হয়ে আমি বিড়ি টানতে পারি, আর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট টিচারের স্বামী হয়ে তোমার তাতে মান যায়। ঘরে যে কত সিগারেট জোটে তা তো মোটা ফুটোওয়ালা নাক দেখেই টের পেয়েছি। দিনে রাতে এক পয়সার নস্যি ছাড়া তোমার অন্য গতি নেই।'

হেডমিস্ট্রেসের স্বামী। এ পাড়ায় এই তার একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। শুধু স্কুলের ছাত্রীরা, তাদের অভিভাবকেরা, টিচ[illegible] আর তাদের স্বামীরাই নয়, গোয়ালা, মুদি, কয়লাওয়ালা, রেশন [illegible] মালিক পর্যন্ত তাকে ওই পরিচয়েই চেনে। [illegible] হেডমিস্ট্রেসের, [illegible] হেডমিস্ট্রেসের, স্বামী হেডমিস্ট্রেসের। এপাড়ায় সুপ্রীতি মুখুয্যে সর্ব[illegible] জনপ্রিয়া। প্রায় আধানেত্রী গোছের মহিলা। আর শৈলেন শুধু সুপ্রী[illegible] স্বামী, স্ত্রীনাম-ধন্য পুরুষ। অথচ বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, উপার্জনে শৈলেন সুপ্রী[illegible] চেয়ে অনেক ওপরে। তবু এখানে সে অখ্যাতনামা, প্রায় অজ্ঞাতনামা। এপাড়া ছেড়ে দিতে হবে শৈলেনকে, সুপ্রীতিকে ছাড়িয়ে নিতে হবে আশ্চর্য, সুপ্রীতিও যেন চায় না শৈলেন এপাড়ায় পরিচিত হোক, তাকে লোকে জানুক, চিনুক, নিজের খ্যাতির আড়ালে স্বামীকে যেন সে সরিয়ে রাখতে চায়। স্ত্রীর ওপর অদ্ভুত এক ধরণের বিদ্বেষ বোধ করল শৈলেন। অথচ এক সময় এই সুপ্রীতি নামটিকে পৃথিবীর কাছে বিখ্যাত করে তোলার জন্য কি না করেছে সে, তখনো বিয়ে হয়নি; কিন্তু কলেজের জনবিরল লাইব্রেরী ঘরে জানাশোনা গভীরতর হয়েছে। ছাপার অক্ষরে সেই গভীর পরিচয়ের সাক্ষ্য রাখবার জন্য সুপ্রীতির নামে কবিতা লিখেছে শৈলেন। শুধু তাই নয়, নিজে লিখে ওর নামে কবিতা ছেপেছে।

সুপ্রীতি আপত্তি করেছে, 'ও কি, তোমার লেখা আমার নামে কেন ছাপালে। আমি তো আর লিখতে জানিনে।'

শৈলেন জবাব দিয়েছে, 'লেখাতে জানো। সেটা কি কম কথা?'

সুপ্রীতি বলেছে, 'তবু মিছেমিছি আমার নাম—'

শৈলেন জবাব দিয়েছে, 'মিছেমিছি কেন হবে। ও নামটা কি কেবল তোমারই। এতে আমার স্বত্ব আরো বেশি।'

সুপ্রীতি স্মিতমুখে স্বীকার করেছে, 'তা তো ঠিকই।'

কিন্তু সেদিন আর নেই।

বাজারে গিয়ে মেছুনীর সঙ্গে ঝগড়া, তরকারীওয়ালার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হোল। তারপর ঘর্মাক্ত দেহে বাজার নিয়ে বাসায় ফিরল শৈলেন।

রাসমণি এসে হাত থেকে থলি নামাল।

শৈলেন বলল, 'তোমার দিদিমণি কোথায়?'

রাসমণি বলল, 'সেক্রেটারী বাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন। বোধ হয় প্রেসিডেন্টের বাড়ীতেই গেলেন। বললেন, জরুরী কাজ।'

শৈলেন বলল, 'হ্যাঁ কাজ তো সবই তার জরুরী। কেবল ঘর সংসারটাই ফালতু।'

ব্যাপার মন্দ নয়। এতদিন জরুরী কাজের আলোচনাটা ঘরে বসেই হোত। মাসখানেক আগে গেছে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী উৎসব। তার উদ্যোগ আয়োজনের পরামর্শের জন্য প্রায়ই আসতেন সেক্রেটারী। কমিটির আরো দু' একজন মেম্বারও এসে হানা দিতেন। আবৃত্তি অভিনয়ের মহড়া চলত স্কুলের ছাত্রীদের। সারা বাসাটা বাজারে পরিণত হয়েছিল। রীতিমত রাজকীয় ব্যাপার। কোন্ এক মন্ত্রী এসে সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর সম্বর্ধনার জন্য আড়ম্বর আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। আর কথায় কথায় দরকার হচ্ছিল হেডমিস্ট্রেসকে। এইটুকু স্বীকৃতি পেয়ে সুপ্রীতিরও উৎসাহের অন্ত

ছিল না। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কর্তৃত্বের মোহ, খ্যাতির লোভ তাকে পেয়ে বসেছিল।

মাঝে মাঝে শৈলেন বাধা দিয়েছিল, 'চাকরি করছ করছ, কিন্তু এত হৈ চৈ করছ কেন।'

সুপ্রীতি জবাব দিয়েছিল, 'হৈ চৈ আর কোথায়। এই উপলক্ষে যদি স্কুলটা দাঁড়ায়, যদি aidটা আসে—'

কেবল স্কুল আর স্কুল। স্কুল ছাড়া কি আর কোন কথা নেই, চাকরি তো শৈলেনও করে। মাইনে সুপ্রীতির চেয়ে বেশিই পায়। কিন্তু অফিসের সঙ্গে সম্পর্ক তার দশটা পাঁচটার। কলম রেখে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীর খোলসটাকে ছেড়ে আসে। কিন্তু সুপ্রীতি তখনো হেডমিস্ট্রেস। স্কুলের কোন না কোন কাজ, কোন না কোন প্রসঙ্গ সে বাসার মধ্যে টেনে আনবেই, বছরে বছরে তিনবার করে পরীক্ষার খাতা আসে। রোজ আসে ছাত্রীদের টাস্কের খাতা। এছাড়াও স্কুলের নানা রকম রেকর্ড, রিপোর্টের দিকে চোখ রাখতে হয় হেডমিস্ট্রেসকে। তাছাড়া আরো নানা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আসে কমিটির সদস্যদের দু' একজন, কি ছাত্রীদের অভিভাবক; সুপ্রীতির বাসাটা বাসা নয়, স্কুলেরই আর এক অংশ।

বিরক্তির অবধি থাকে না শৈলেনের, মাঝে মাঝে সে বিরক্তি প্রকাশও করে, 'বাসাটা যে বাজার হয়ে উঠল। আমাকে তাড়াবার মতলব না কি তোমার?'

সুপ্রীতি হাসে, 'সত্যি, তোমার বড় অসুবিধা হয়। কিন্তু কি করি বল, দরকারের জন্যই তো লোকে আসে। আচ্ছা এরপর থেকে অন্য ব্যবস্থা করব।'

স্কুলের অফিস রুমে বসেই কিছুদিন দরকারী কাজ সারে সুপ্রীতি, বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। শৈলেনের তাও ভালো লাগে না। অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে সামনে না দেখলে কার মেজাজ না বিগড়ে যায়?

আজও মেজাজ বিগড়াল শৈলেনের। সেক্রেটারীর সঙ্গে কোথায় বেরুল সুপ্রীতি, কেন বেরুল? স্কুলের কাজের দোহাই পেড়ে যখন তখন যার তার সঙ্গে বেরুলেই হবে? একটা শোভনতা বোধ নেই? পাড়ার লোকে কিছু ভাবতে পারে সে ভয়টাও কি নেই? মিণ্টুও ঘরে নেই। পাশের বাসার সমবয়সী ছেলেটির সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে কি যেন নতুন খেলা খেলতে সুরু করেছে। জানলা দিয়ে চোখে পড়ল শৈলেনের।

মুখ বাড়িয়ে মেয়েকে ধমক দিল শৈলেন, 'এই মিণ্টু, ঘরে এসো।'

মিণ্টু ঘরে এল না, শুধু ক্রীড়া সঙ্গীকে নিয়ে বাপের চোখের সামনে থেকে সরে গেল। ওরও তাহ'লে চক্ষুলজ্জা আছে।

ভারি নিঃসঙ্গ অসহায় আর অবজ্ঞাত বোধ করল শৈলেন। ভাবল সেও কোথাও বেরিয়ে পড়বে। খুঁজলে দু' একজন প্রাক্তন বান্ধবী তারও কি মিলবে না সারা সহরে?

তাড়াতাড়ি দাড়িটা কামিয়ে নিল শৈলেন। স্নান শেষ ক'রে আয়নার সামনে এসে মাথা আঁচড়াতে লাগল। বন্ধুমহলে সুপুরুষ বলে খ্যাতি আছে তার। বান্ধবীমহলে সে খ্যাতি আরো বেশি। ক্লাসে অমন দীর্ঘ চেহারা, ফর্সা রঙ বড় একটা চোখে পড়ত না। আর চোখে পলক পড়ত না সহপাঠিনীদের। তাদের দলে ছিল সুপ্রীতি। কিন্তু সে আজ আর সহাধ্যায়িনী নয়, হেডমিস্ট্রেস।

লণ্ড্রি থেকে ফর্সা ধুতি জামা কাল আনিয়ে রেখেছিল শৈলেন। কিন্তু কাল ভাঙেনি। ভেবেছিল আজ বিকালে একসঙ্গে বেরুবে সুপ্রীতির সঙ্গে। যাবে কোন সিনেমায়। কিন্তু বিকালের আগেই সদ্য ধোয়া জামাকাপড়ের পাট ভাঙবার দরকার হোল।

দেড়টাকা বাজারেই শেষ হয়েছে। মনে পড়ল রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে দু' টাকার একখানা নোট সেদিন লুকিয়ে রেখেছিল শৈলেন। এমন গোপন সঞ্চয় পরস্পরকে লুকিয়ে দু'জনেই মাঝে মাঝে করে। সে টাকা দুঃসময়ে

সংসারের জন্যই ব্যয় হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সংসারও নেই, কেউ নেই। দু' টাকার নোটখানা শৈলেন সন্তর্পণে বুক-পকেটে রেখে দিল।

রাসমণি রান্নাঘর থেকে বলল, 'ওকি দাদাবাবু, এই অসময়ে না খেয়েদেয়ে কোথায় বেরুচ্ছেন। খেয়ে যান। আমার মাছের ঝোল এই নামল বলে। বেশ তেল আছে কিন্তু ইলিশ মাছটায়।'

তেলালো ইলিশ মাছের কথা শুনে আজ আর জিভ সজল হোল না শৈলেনের। শুকনো, রুক্ষ গলায় বলল, 'বাসায় আজ আর আমি খাব না, বলিস তোর দিদিমণিকে।'

রাসমণি হেসে মুখ বাড়াল, 'নেমন্তন্ন আছে বুঝি দাদাবাবু? সে কথা আগে বলতে হয়।'

শৈলেন মনে মনে ভাবল, নিমন্ত্রণ অবশ্য নেই, কিন্তু কোথাও কিছু না জোটে, হোটেল তো আছে। হেডমিস্ট্রেসের এই বাসার চেয়ে তা অনেক ভালো।

কিন্তু ঘর থেকে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সদর দরজায় কার গলা শোনা গেল, 'সুপ্রীতিদি' আছেন?'

বিরক্ত হয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল শৈলেন, কিন্তু দোরগোড়ায় আর একটি তরুণীর মুখ দেখা গেল। শীর্ণ শুষ্কমুখী কোন মিস্ট্রেস-টিস্ট্রেস নয়, বিদ্যাবীথির প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী সপ্তদশী, অর্চনা মিত্র। আকাশ রঙের শাড়িটি আঁট সাঁট ক'রে পরা। গায়ে গৌরবর্ণের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে। রঙীন ব্লাউজের হাতায় লতানো নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য। প্রসাধন মার্জিত সুন্দর ভরাট মুখ। পিঠের বেণী কোমর ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পড়েছে। গলায় সরু হার। ব্লাউসে গোঁজা একটি সেফার্স পেনের চূড়া। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল শৈলেন, 'না, সে তো এখন নেই।'

অর্চনা বলল, 'হেডমিস্ট্রেস নেই বুঝি?'

শৈলেন একটু হাসল, 'না হেডমিস্ট্রেসও নেই, সুপ্রীতিও নেই। এসো ভিতরে। হয়তো একটু বাদেই তোমাদের হেডমিস্ট্রেস এসে পড়বেন।'

অর্চনা এবার একটু ভরসা পেয়ে বলল, 'না, না, তিনি না এসে পড়লেই ভাল। গোপনে গোপনে আপনার কাছ থেকে নম্বরটা জেনে যাওয়া যাবে। আচ্ছা, আমাদের ইংরাজী খাতা দেখা হয়ে গেছে, না? এবারও কি খুব কড়া ক'রে খাতা দেখেছেন নাকি হেডমিস্ট্রেস?

শৈলেন মৃদু হাসল, 'কি জানি।'

অর্চনা বলল, 'এবারও যদি খারাপ নম্বর পাই, বাড়িতে আর মুখ দেখাতে পারব না। কত পেয়েছি জানেন?'

শৈলেন বলল, 'না জানলেও, জানতে কতক্ষণ! খাতাগুলিতো ঘরেই আছে, এসো না!'

অর্চনা বলল, 'আসব? কিন্তু হেডমিস্ট্রেস এসে পড়বেন না তো?' এই আশঙ্কার অন্য অর্থ হতে পারে ভেবেই কি অর্চনা অমন আরক্ত হয়ে উঠল, না কি তার রক্তবর্ণের কর্ণাভরণেরই ছটা গালে গিয়ে পড়ল?

শৈলেন বলল, 'এলেন-ই-বা, এতো আর তাঁর স্কুল নয়। এসো ভিতরে। তাছাড়া অত ভয় থাকলে কি গোপনে গোপনে নম্বর জানা যায়।'

ভরসা পেয়ে অর্চনা শৈলেনের পিছনে ঘরে এসে ঢুকল। ওর হাতে একখানা পাতলা খাতা। বইপত্র কিছুই নেই। ধরণটা অনেকটা কলেজী কলেজী। বয়সের তুলনায় ওকে বড়ও দেখায়। সাধারণ উকিলের মেয়ে। কিন্তু বাড়ির অবস্থার তুলনায় ওকে স্বচ্ছল দেখায় বেশি। নাকি উজ্জ্বলতাই ওর ঐশ্বর্য।

বেতের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ওকে বসতে বলল শৈলেন। কিন্তু অর্চনা বসল না। সরে এসে বইয়ের র‍্যাকের সামনে দাঁড়াল! 'বাঃ, এত বই জোগাড় করেছেন? এর আগের বারেও তো এত বই ছিল না। রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই খণ্ডগুলি নতুন কিনেছেন বুঝি?'

শৈলেন বলল, 'হ্যাঁ!'

নতুনই কিনেছে। টানাটানির সংসারে অনেক কষ্ট হয়েছে কিনতে। কিন্তু কিনে লাভ কি হোল। রবীন্দ্রনাথ আর পড়া হয় না। পড়বার সময় নেই, সঙ্গিনী নেই।

বইয়ের র‍্যাকের কাছে একটু এগিয়ে এল শৈলেন, 'কবিতা তোমার ভালো লাগে?'

অর্চনা হেসে মুখ ফিরাল, 'কবিতা আবার ভাল লাগে না, কার। খুব ভাল লাগে। ইংরেজী বাঙলা দুই-ই। ভাল লাগে না কেবল ট্রানস্লেশন আর গ্রামার।'

শৈলেন হেসে বলল, 'আমারও।'

অর্চনা বলল, 'তাই নাকি? আপনিও'—

কথাটা শেষ হ'ল না অর্চনার। দোরের কাছে হেডমিস্ট্রেস এসে দাঁড়িয়েছেন। শৈলেনের কাছ থেকে দু' পা পিছিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল অর্চনা।

সুপ্রীতি দুজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'অর্চনা তুমি এখানে কেন? সাড়ে দশটা বাজে। তোমাদের ক্লাশ আরম্ভ হয়ে গেছে না?'

রোদেপোড়া তামাটে মুখ সুপ্রীতির। ভারী নিষ্ঠুর, ভারী নির্মম মনে হল অর্চনার। হঠাৎ তার মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না।

কথা বলল শৈলেন, 'আমিই ওকে ডেকে এনেছি।'

সুপ্রীতি বলল, 'ডেকে এনেছ, কেন?'

শৈলেন একটু হাসল, 'ডাকলাম। ডাকতে ভাল লাগল।'

মুহূর্তের জন্য সুপ্রীতিও তার ছাত্রীর মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

মনে মনে নিষ্ঠুর একটা কৌতুক বোধ করল শৈলেন। এবার? এবার কোথায় রইল তোমার হেডমিস্ট্রেসগিরি?

মাত্র একটি কথায় তোমার ফেল-করা ছাত্রীকে এখনও আমি এমন ডবল, চৌডবল প্রমোসন দিয়ে দিতে পারি, তা জান? এদিক থেকে তোমার সেক্রেটারী প্রেসিডেণ্টের চাইতে ক্ষমতা কোন অংশে কম নয় আমার। বরং অনেক গুণ বেশি।

অর্চনা বলল, 'আমি যাই প্রীতিদি, নম্বর জানতে এসেছিলাম।'

সুপ্রীতি রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'নম্বর তো ক্লাসে বসেই জানতে পারতে। জানবার আবার কি আছে? এবারও তো ফেল করেছ। যাও, ক্লাসে যাও।'

প্রায় যেন ঘাড় ধ'রে ওকে বের করে দেবে সুপ্রীতি। ধমক খেয়ে অপমানিত অর্চনা এবার ঘাড় ফিরাল, তারপর মরিয়া হ'য়ে বলল, 'আপনার হাতে যখন খাতা পড়েছে, ফেল তো করবই। এ আর নতুন কথা কি।'

সুপ্রীতি চেঁচিয়ে উঠল, 'এত স্পর্ধা তোমার! বেয়াড়া বকাটে মেয়ে!'

কিন্তু অর্চনা ততক্ষণে সদর পার হয়ে গেছে। বেশ হয়েছে। এতদিন বাদে ঠিক মুখের মত জবাব দিতে পেরেছে সে হেডমিস্ট্রেসকে। এখন তিনি যত গালাগালিই করুন জিৎ অর্চনারই। ঠিক হয়েছে।

হিংস্র আক্রোশে শৈলেনও মনে মনে ভাবল, 'ঠিক হয়েছে।'

ভারি নিষ্প্রভ আর করুণ দেখাচ্ছে সুপ্রীতির মুখ। পরাজিত শত্রুর ওপর এবার করুণা দেখানো যায়।

শৈলেন কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সুপ্রীতি তা' শুনবার জন্য অপেক্ষা না করে রান্নাঘরে চলে গেল, 'মিণ্টুকে ডেকে আন রাসমণি' ওর কি নাওয়া খাওয়া নেই? ভাত বাড় আমার বেলা হয়ে গেছে ইস্কুলের।'

রাসমণি বলল, 'বেলা তো সকলেরই হয়েছে বড়দিদিমণি। দাদাবাবুও খান নি। ওঁর নাকি কোথায় নেমন্তন্ন আছে।'

শৈলেন তাড়াতাড়ি বলল, 'না না না, আমি এখানেই খাব। নিমন্ত্রণে আজ আর যাব না।'

মেয়েকে নিয়ে পাশাপাশি খেতে বসল দুজনে। কিন্তু সুপ্রীতির মুখে কোন কথা নেই। শৈলেনের উপস্থিতিকে সে অগ্রাহ্য করছে।

খেতে খেতে হঠাৎ রাসমণির দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্কুলের কোন মেয়েকে আমার ঘরের বইপত্র ঘাঁটতে দিস্‌নে; বুঝলি। আগেই বারণ করবি।'

শৈলেন বলল, 'শুধু সেক্রেটারীর বেলায় এ নিয়ম খাটবে না। তিনি যত ইচ্ছা বই ঘাঁটতে পারেন।'

সুপ্রীতি স্বামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'ইতরামিরও একটা সীমা আছে।'

শৈলেন বলল, 'কিন্তু সে সীমাটা কোন ছাত্রীর বেলায় না মানলে দোষ হয় না। হঠাৎ অমন ক'রে কোথায় বেরিয়েছিলে?'

সুপ্রীতি বলল, 'তা শুনে কি দরকার তোমার। বেড়াতে কি হাওয়া খেতে বেরোই নি। স্কুলের কাজেই বেরিয়েছিলাম।'

শৈলেন অদ্ভুত একটু হাসল, 'ওরকম স্কুলের কাজ তো তোমার চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে।'

সুপ্রীতি রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'আছেই তো। স্কুলের কাজ আছে বলেই সংসার চলছে খাওয়া জুটছে।'

ভাতের গ্রাস মুখে না তুলে শৈলেন বলল, 'কী কি বললে?' কিন্তু সুপ্রীতি আর কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে মেয়েকে খাওয়াতে লাগল।

শৈলেন স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার রোজগার করা টাকা ফের যদি আমি হাত দিয়ে ছুঁই, আমার নাম ফিরিয়ে নাম রেখ।'

সঙ্গে সঙ্গে আসন থেকে উঠে দাঁড়াল শৈলেন।

রাসমণি বলল, 'ওকি দাদাবাবু, ভাত যে পড়ে রইল, মাছের ডিমের টক আছে। উঠবেন না, উঠবেন না, শুনুন।'

কিন্তু শৈলেন ততক্ষণে জলের ঘটি নিয়ে আঁচাবার জন্য উঠানে নেমে পড়েছে।

রাসমণি সুপ্রীতির দিকে চেয়ে বলল, 'কাজটা তোমারও ভাল হয় নি দিদিমণি। ছি ছি ছি, সোয়ামীকে মেয়েমানুষে খাওয়ার খোঁটা দেয় কোন দিন? বাপের জন্মেও তো দেখি নি—।'

মিণ্টু বলল, 'বাবা ডিমের টক খেল না কেন মা।'

ডিমের টক অবশ্য সুপ্রীতিও খেল না, মেয়েকে বলল, 'তুই বসে বসে খা। আমার বেলা হয়ে গেছে।'

একটু বাদে পরীক্ষার খাতাগুলি বগলে নিয়ে সুপ্রীতি স্কুলে বেরিয়ে গেল। রাসমণিও গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, বাসার কাছেই স্কুল। এক ফাঁকে সে স্কুলের কিছু কাজ আগেই সেরে এসেছে।

মেয়েকে ডেকে শোয়াল শৈলেন। বাবার মেজাজ দেখে আজ আর মিণ্টু তাকে বেশি বিরক্ত করল না, গল্প বলবার বায়না করল না, অল্পেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু শৈলেনের ঘুম এল না; খানিকক্ষণ একটা বইয়ের পাতা ওলটালো, মন লাগল না; তবু আরো ঘণ্টাখানেক গড়িমসি করে কাটিয়ে দিয়ে বাসা আর মেয়ের দায়িত্ব পাশের ঘরের ভাড়াটে বউটির ওপর গছিয়ে শৈলেন এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত দুনিয়াটাই ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সময় আর কাটিতে চায় না, তবু কাটল। বিড়ির আগুনে পুড়তে পুড়তে দিন শেষ হোল। অঙ্গারের রঙ লাগল আকাশে।

পাড়ার একটা চায়ের দোকানে উঠে বসল শৈলেন।

'দেখি এক কাপ চা।'

কিন্তু দোকানী চায়ের কাপটি সামনে দিতে না দিতেই পুরোন বন্ধু হেরম্ব হালদার এসে ঢুকলো দোকানে, 'এই যে শৈলেন, চা খাচ্ছ নাকি?' দোকানীকে আর এক কাপ চা দিতে বলল শৈলেন। কিন্তু চা খেয়েও হেরম্ব নিবৃত্ত হোল না, বলল, 'ইয়ে তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

গোটা পঁচিশেক টাকা পেত হেরম্ব। মেয়ের অসুখের সময় নিতে হয়েছিল। টাকা পনেরো শোধ দিয়েছে। দশ টাকা এখনো বাকি।

শৈলেন সংক্ষেপে বলল, 'কাল নিয়ো।'

হেরম্ব বলল, 'কাল? আচ্ছা কাল পেলেই চলবে। ভারি টানাটানি যাচ্ছে। কিছুতেই আর কুলোতে পারছি না ভাই। তোমার আর কি, তুমি তো চতুর্ভুজ। ঘরে বাইরে দু'জনে সমানে রোজগার করছো। গার্লস স্কুল বুঝি আজই ছুটি হয়ে গেল?'

শৈলেন বলল, 'হুঁ।'

হেরম্ব বলল, 'তাহ'লে কাল সকালে, কি বল?'

শৈলেন বলল, 'বললামই তো।'

চায়ের দোকান থেকে নেমে একটু এগুতেই কামধেনু ডেয়ারীর এককড়ি নন্দীর সঙ্গে দেখা। সাইকেল করে দুধ জুগিয়ে ফিরছে। হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো বড় বড় গোটা দুই কেৎলি, শৈলেনকে দেখে আকর্ণ হেসে বলল, 'এই যে স্যার।'

শৈলেন বলল, 'হুঁ।'

এককড়ি বলল, 'কাল যাব বিল নিয়ে। হেডমিস্ট্রেসকে বলবেন পুজোর পার্বনী এবার কিন্তু ভালো রকম দিতে হবে। সামনের বছর থেকে আমার মেয়েকেও দেব স্কুলে।'

আরো বেশিক্ষণ পথে ঘুরলে ধোপার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, মুদির সঙ্গে দেখা হওয়াটাও বিচিত্র নয়। তার চেয়ে ঘরই ভালো।

ঘরে তখন আলো জ্বলছে। চটি বইয়ে মিণ্টুর মন ওঠে না, মোটা অক্সফোর্ড ডিক্সনারীখানা নিয়ে সে পড়তে বসেছে। মেয়ের হাতে কাজের বই দেখেও আজ আর সুপ্রীতি কেড়ে নেয়নি। ওর হয়েছে কি, 'তোর মা কই রে?'

মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল শৈলেন—

মিণ্টু বলল, 'ওই তো জানলা দিয়ে গাড়ী ঘোড়া দেখছে। একটু আগে কত বড় একটা ঘোড়া যাচ্ছিল বাবা তুমি তো দেখলে না।'

সত্যিই জানলার গরাদের সঙ্গে মিশে বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল সুপ্রীতি। সামনে ফাঁকা এক খণ্ড মাঠ। গাড়ি ঘোড়া কিছু সেখানে শৈলেনের চোখে পড়ল না। হেরম্ব আর এককড়ির তাগিদ সে একা কেন ঘাড় পেতে নেবে। শৈলেন মনে মনে ভাবল। এসব খরচের জন্য দায়ী তো সুপ্রীতিও। পাওনাদারদের তাগিদটা ওর কাছেও পৌঁছুক। তারপর শৈলেন নিতান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে যেন গরাদকেই সম্বোধন করে বলল, 'হেরম্ব আর এককড়ির সঙ্গে দেখা হোল, ওরা কাল আসবে।'

সুপ্রীতি একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গীতে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এলেই বা কি করব?'

ওর কালো আয়ত দুটি চোখ যেন বিষণ্ণ, কিন্তু শান্ত আর গভীর হয়ে উঠেছে।

শৈলেন চমকে উঠল, 'এলেই বা কি করব মানে? মাইনে পাওনি?'

সুপ্রীতির কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেল না। শৈলেন চীৎকার করে ডাকল, 'রাসমণি! এদিকে এসো তো।' রাসমণি এসে সামনে দাঁড়াতে শৈলেন তেমনি তারস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি? মাইনে হয়নি স্কুলে?'

ব্যাপারটা রাসমণির কাছ থেকে পুরোপুরিই শোনা গেল। ও গোড়া থেকেই সব জানে। শুধু সেক্রেটারী নিষেধ করেছিলেন বলেই আগে কিছু বলেনি।

স্কুলের তহবিলে তেমন টাকা নেই। গত মাসে পুরস্কারবিতরণী আর সভাপতির সম্বর্ধনায় বহু টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এদিকে ছাত্রীদের মাইনেও তেমন আদায় হয়নি। সেক্রেটারী সেই কথাই হেডমিস্ট্রেসকে জানাতে এসেছিলেন। টিচারদের দু'মাসের মাইনে কোন রকমেই দেওয়া সম্ভব নয়। এখন

তাঁরা এক মাসের বেতনই নিন। পরে ছুটির মধ্যে দিন পনের পরে আবার না হয় সেক্রেটারী একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সুপ্রীতি তাতে রাজী হয় নি। পঞ্চাশ ষাট টাকা এক-একজনের মাইনে। পুজোর মাসে দু' মাসের টাকা না পেলে টিচারদের চলবে কি করে। এই নিয়ে অনুকূলবাবুর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা কথান্তরও হয়েছিল সুপ্রীতির।

অনুকূলবাবু চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'বেশ আপনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন ভালোই তো, আমার আর কিছু করবার সাধ্য নেই।'

স্থানীয় জমিদার রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী স্কুলের প্রেসিডেন্ট। সেক্রেটারীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে ছুটেছিল সুপ্রীতি। কিন্তু দেখা হয়নি। দারোয়ান বলে দিয়েছে, তাঁর ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কথা বলা বারণ। তাড়াতাড়িতে কমিটির আর কোন মেম্বারের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারেনি সুপ্রীতি। তা'ছাড়া ছুটিতে অনেকেই তাঁরা বাইরে চলে গেছেন।

সেক্রেটারী বাড়ি গিয়ে এগারটার সময় চাকরের হাতে চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাতে সব টিচারের এক মাসেরও পুরো মাইনে হয় না। চেকের সঙ্গে হেডমিস্ট্রেসের নামে এক টুকরো নোটও ছিল। স্কুলের নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তাতে এর চেয়ে বড় চেক কাটা যায় না। হেডমিস্ট্রেস যেন তাঁর সহকারিণীদের বুঝিয়ে শান্ত রাখেন। মিসেস মুখার্জির যদি বেশি দরকার থাকে তিনি ইচ্ছা করলে দু' মাসের মাইনে নিয়ে নিতে পারেন। তাঁর কাছে স্কুল কমিটি কৃতজ্ঞ। কিন্তু যে সব টিচারের যোগ্যতা কম, রেকর্ড খারাপ, তাঁদের পার্ট-পেমেণ্ট করাই বিধেয়।

স্কুলের টিচারদের ডেকে সব কথাই খুলে বলেছিল সুপ্রীতি। সকলেই বিস্মিত হয়েছিল, ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু যা পাওয়া যায় তা হাত ছাড়া করতে কেউ রাজী হয়নি। কালই তো রেশনের টাকার দরকার হবে, তখন উপায় হবে কি।

প্রথমে নিজের এক মাসের মাইনেটা আলাদা করেই রেখেছিল স্থপ্রীতি। কিন্তু বেশিক্ষণ রাখতে পারেনি। অঙ্কের টিচার অমলা দত্ত প্রায় কাঁদো কাঁদো হবার জো, 'এই চল্লিশ টাকায় আমার কি হবে দিদি। ওঁর যে সাংঘাতিক অস্থখ। ডাক্তারেরই যে অনেক টাকা পাওনা। আরও অন্ততঃ গোটা কুড়ি টাকা আমাকে দিন। আমার কাছে এর পর থেকে আর কোন গাফিলতি পাবেন না, খুব খেটে পড়াব।'

পনের টাকা সে না নিয়ে ছাড়ল না।

তারপর এল নীলিমা রায়, রেখা ভৌমিক, উমা চন্দ। কারো স্বামীর চাকরি নেই, কারো বাবার মাইনে কাটা গেছে। সকলেরই ধারে-দেনায় অস্থখে বিস্থখে সংসার অচল। রমা বস্থ, সবিতা সেন, ললিতা চক্রবর্তীরও একই দশা।

শৈলেনের দিকে তাকিয়ে রাসমণি বলল, 'দাদাবাবু, এমন বোকা মেয়েমানুষ আমি আমার বাপের জন্মেও দেখিনি। দিতে দিতে সব শেষ। কোন্ বিত্যাবুদ্ধিতে যে ইস্কুলের বড়দিদিমণি হয়েছিলেন তা উনিই জানেন। আমার মাইনেটা পর্যন্ত দিল না। দিলে কি আমি আর কাউকে বিলিয়ে ফিরিয়ে আসতুম? ভালোবাসার মানুষ আছে আমার সংসারে ক'জন? না কি গণ্ডা দু' তিন ছেলেমেয়ে কোথাও আছে? আছে নাকি?'

শৈলেন ঘাড় নেড়ে জানাল, ওসব রাসমণির নেই।

রাসমণি বলতে লাগল, 'ফুরুতে ফুরুতে শেষে যখন গোটা পাঁচেক টাকা বাকি, আমি হাত চেপে ধরলাম,—কর কি বড়দিদিমণি, কালই যে হাঁড়ি চড়বে না। রেশনের টাকাটা অন্তত রাখ।'

শৈলেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেই পাঁচ টাকা এনেছ নাকি, না তাও আনো নি?'

স্থপ্রীতি বলল, 'এনেছি।'

শৈলেন বলল, 'কই, দেখি।'

খোলা দেরাজ টেনে তার ভিতর থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট বের ক'রে ম্লান মুখে এগিয়ে ধরল সুপ্রীতি। শৈলেন হঠাৎ সেই নোটশুদ্ধ স্ত্রীর কোমল হাতখানা নিজের বিপুল মুঠির মধ্যে চেপে ধ'রে ডাকল 'প্রীতি!'

সুপ্রীতি টাল সামলাতে পারল না।

রাসমণি লজ্জায় জিভ কেটে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছি ছি ছি কাণ্ডজ্ঞান যদি এদের থাকে। মানুষ জন ঘরে রইল কিনা সে খেয়াল পর্যন্ত নেই—ছি ছি ছি। ভালবেসে বিয়ে করলে লোকে কি এমনই দিশেহারা হয়!

সকালের ডাকে দু খানা চিঠিই একসঙ্গে পেলাম।

একসঙ্গে এলেও দুখানার মধ্যে কোন রকম কোন সাদৃশ্য ছিল না, একখানা এনভেলাপ, আরেকখানা সাধারণ সরকারী এনভেলপ নয়, কাঁঠালী-চাঁপা রঙের বড় লেফাপা, বাঁ দিকে কোণাকুণিভাবে লেখা 'শুভবিবাহ'। সেইখানাই আগে খুলে দেখলুম, নিজের ও-পাঠ শেষ হয়েছে অনেকদিন, সেদিন নিমন্ত্রণের রঙীন চিঠি আমিও বন্ধুবান্ধবদের পাঠিয়েছিলাম, প্রথম দু' এক বছর তার এক আধখানা নিজের ঘরেও ছিল। এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। খোঁজেই বা কে। তবু এখনো [illegible] হলদে কি গোলাপী রঙের চিঠি মাঝে মাঝে পাই, রং যেন কেবল চিঠির গায়েই লেগে থাকে না ; মনের মধ্যেও তার ছোপ লাগতে চায়।

মনে মনে হাসলুম। কার আবার কপাল পুড়ল। লেফাপা খুলে বের করলাম গোলাপী রঙের চিঠি, দু' চার লাইন পড়তেই বুঝতে পারলাম, সব মনে পড়ে গেল, হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার পরেশ মজুমদারের ছেলে অসিতের বিয়ে, এ বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র পাওয়ার কোন প্রত্যাশা ছিল না, কলেজে অসিতের সঙ্গে পড়েছিলাম বছর কয়েক, সেই সূত্রে তখনকার দিনে অল্পস্বল্প ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল, তারপর বহুকাল ছাড়াছাড়ি, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, কিন্তু সেদিন বাড়িওয়ালার এক টাইটেল স্যুটের মোকর্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ফের দেখা হয়ে গেল, চিনবার কথা নয়, তবু অসিত চিনে ফেলল।

'আরে কল্যাণ যে, এস এস।'

কাঁধে হাত দিয়ে বার লাইব্রেরীতে তার সীটে আমাকে টেনে নিয়ে গেল [illegible], সামনের চেয়ারে বসতে দিয়ে বলল, 'তারপর খবর-টবর কি।'

ঘর ভরা প্রবীণ নবীন ব্যারিস্টার দল। ইউরোপীয় বেশ বাস, কারো

মুখে পাইপ, কারো সিগারেট, অসিতও বছর তিনেক আগে বিলাত ঘুরে এসেছে। দীর্ঘাঙ্গ, সুপুরুষ, সাহেবী পোশাকে চমৎকার মানিয়েছে তাকে, আধ-ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবীতে যেন একটু মক্কেল মক্কেলই মনে হোল নিজেকে অসিতের ঠিক বন্ধুশ্রেণীভুক্ত নিজেকে ভাবতে পারলাম না।

কিন্তু কথায়বার্তায় ব্যবহারে অসিত ঠিক আগের আমলটা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। সিগারেট অফার করল, চা আনাল, তারপর নিজের পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, 'আঃ ভালো হয়ে ছড়িয়ে-টড়িয়ে বসো। অমন কুঁচকে রইলে কেন, কতকাল পরে দেখা হোল বল দেখি, আছ কোথায়, করছ কি ?'

বললুম, 'বিশেষ কিছু না। তার আগে তোমার কথাই শুনি।'

অসিত হাসল, 'আমারই বা এমন কি বিশেষত্ব। একেবারে ব্রীফলেস নই। বাপের দোহাইতে ব্রীফ কিছু কিছু আসে, বাস্, ওই পর্যন্ত, এবার তোমার খবর কি বল।'

'খবর আর কি, এ অফিস থেকে ও অফিসে কেরানীগিরি করে বেড়াচ্ছি। দু-এক বছর অন্তর অন্তর বদলাচ্ছি অফিস।'

অসিত বলল, 'এহ বাহ্য, কাব্য সাহিত্যের খবরটবর বল শুনি। চর্চাটা এখনো রেখেছ তো।'

বললুম, 'হ্যাঁ, ভূতটা এখনো নামেনি ঘাড় থেকে।'

অসিত হাসল, 'সবাইর কাঁধ থেকেই যদি ও ভূত নামে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে নাকি, ভালো কথা মনে পড়ল, একটা কাজ ক'রে দাও দেখি আমার।'

'বল !'

অসিত বলল, 'বন্ধুদের তরফ থেকে বন্ধুর বিয়েতে একটা উপহার-টুপহার গোছের কিছু লিখে দাও দেখি, পদ্য নয়, পদ্য বড় সেকেলে হয়ে গেছে, একেলে মানুষের ভাষা গদ্য, গদ্যেই লেখ, কিন্তু বেশ নতুন রকমের হাওয়া চাই।'

বললুম, 'ওসব উপহার-টুপহারের চলন তোমাদের মধ্যেও আছে নাকি?'

'আমাদের মধ্যে মানে?' অসিত হেসে উঠল, 'তুমি বুঝি আর আমাদের মধ্যে নও? না কি বিলাত ঘুরে এসেছি বলে একেবারে কেষ্টবিষ্টু হয়ে গেছি ভেবেছ? না বাবার একখানা বাড়ি আর দু'খানা গাড়ি আছে বলে বুর্জোয়া নাম দিয়ে বেদলে ঠেলছ আমাদের?' অসিত আবার একটু হাসল 'ভুল করছ, আসল বুর্জোয়া ক্রোড়পতি ক্যাপিটালিস্টরা। আমরা কি, হাতীর কাছে, পিঁপড়ে, তোমরা আমরা বলো না। সব আমরা। সব সমান, সবাই সেই ব্যাকুল চিত্ত মধ্যবিত্ত পিত্তপড়া পেট সেই' অসিত সশব্দে হাসল 'এ ধরণের কবিতা আজকালও লেখ নাকি? সেই যে ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলে? মনে আছে?'

মনে ছিল না, মনে পড়ল। লাইনটা অসিতের মনে আছে দেখে ভালোও লাগল খুব।

বেয়ারা ডেকে ক্লার্ককে খবর দিল অসিত, তারপর তার কাছ থেকে সাদা কাগজ একখানা চেয়ে নিয়ে আমার সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'নাও লেখ।'

বললুম 'এখনি?'

অসিত হেসে বলল, 'তবে কি একমাস বাদে? তোমাদের চালু কলম, ক'মিনিট আর লাগবে লিখতে। পাড়ার ক্লাবের বন্ধুরা ধরে পড়েছে। ভাগ্যক্রমে তোমাকে যখন পেয়ে গেলাম, তুমিই লিখে দাও, না হলে ওরা নিজেরা যা বিদ্যা ফলাবে তা আর কান পেতে শোনা যাবে না, নাম ধাম পরে বলছি, আগে ভিতরকার কথাটুকু চট্ ক'রে লিখে দাও দেখি।'

চট্ করে কোন জিনিস লেখার অভ্যাস নেই, তবু যা হোক দু চার ছত্র কোন রকমে লিখে দিলাম।

পাইপে আস্তে আস্তে টান দিতে দিতে অসিত বলল, 'বাঃ, বেশ হয়েছে এবার আন্দাজ করো দেখি এ ব্যাপারে আমার রোলটা কি।'

কথার ধরণে আন্দাজ করাটা শক্ত হোল না, বললুম 'বিয়ে, করছ বুঝি?

অসিত বলল, 'আঃ কোথায় একটু কাব্য-টাব্য করে বলবে, তা নয় একেবারে সরাসরি জেরা করছ, এসো কিন্তু, না এলে ভারি দুঃখিত হব। যথা সময়ে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণও করব, ত্রুটি মার্জনা কোরো।'

বড় লেফাফার মধ্যে দামী কাগজে সেই বড়লোক বন্ধুর বিয়ের ছাপান চিঠি, জবানী অবশ্য বন্ধুর নয় তার বাবার। কিন্তু এক কোণায় অসিত নিজেও এক লাইন লিখে দিয়েছে, অবশ্য, এসো। লৌকিকতার পরিবর্তে লেখকের নিজস্ব বইয়ের সেট প্রার্থনীয়।'

ভারি ভালো লাগল, বড় লোক বলে অসিত পুরোন সহপাঠীকে ভোলেনি। চাল-চলনে, কথা-বার্তায় সেই আগের দিনের ঘনিষ্ঠতাটুকু এখনো বজায় রেখেছে। বিয়ে গেছে তিন দিন আগে, আজ ওদের সদানন্দ রোডের বাড়িতে প্রীতিভোজ। সময় বেঁধে দিয়েছে। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আটটা।

এবার পোস্ট কার্ডখানার দিকে তাকালাম। সম্বোধনটুকু দেখেই বুঝতে পারলাম এ চিঠির মালিক আমি নই, আমার স্ত্রী। তবু চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। লিখেছে মল্লিকা। আমার পিসতুতো ভাইয়ের শালী। বিয়ের পর আরও একটু সম্পর্ক বেড়েছে। ইন্দিরার খুড়তুতো ভাইয়ের সম্বন্ধী বিয়ে করেছে মল্লিকাকে। সেই সম্পর্কের জের টেনে মল্লিকা লিখেছে, ভাই ইন্দুদি, কত কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। মনেই হয় না এক শহরে আছি। সেদিন হাজরা রোডের মোড় থেকে দেখলাম আপনাদের। আপনারা ট্রামে যাচ্ছিলেন। খুব কথা বলছিলেন নিজেদের মধ্যে, তাই বাইরের দিকে তাকালেনই না। খুব ইচ্ছা করে নিজেই গিয়ে একবার দেখা সাক্ষাৎ করে আসি। কিন্তু কি করে যাব ভাই সময় পেয়ে উঠি না। ছেলেপুলে, সংসারের ঝামেলা তা ছাড়া, উনিও এক মুহূর্ত সময় পান না। প্রেসের চাকরি। ছুটির দিনেও ওভার-টাইমের জন্য বেরুতে হয়। নিজের শরীরও ভালো না। আবার সেই চোখের উপসর্গ বেড়েছে। ভালো কথা, মেডিকেল কলেজে আপনার একজন মামা আছেন

না চোখের ডাক্তার? তিনি কি এখনো ঐ কলেজেই আছেন? কিভাবে তাঁকে ধরা যায়। দয়া করে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন একবার? কল্যাণ-বাবু কেমন আছেন? তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন। আপনিও নেবেন। ইতি—মল্লিকা।—পুনশ্চ আমাদের মনোহর পুকুর রোডের বাসার নম্বর মনে আছে তো? চোদ্দ নম্বর। আপনি বলেন কিনা, চেনা বাড়িতে চিঠি লেখা অসুবিধা। নম্বর ঠিক থাকে না।'

সাধারণ গতানুগতিক চিঠি। ইন্দিরাকে ডেকে হাতে দিলাম, তার সেখানা নিয়েও ইন্দিরা হাত বাড়াল বিয়ের চিঠিখানার দিকে। বলল, 'ওখানা বুঝি দেখতে পারি না?'

বললুম, 'পার, কিন্তু পেরে লাভ নেই। নিমন্ত্রণটা সবান্ধবে, সস্ত্রীক নয়।'

ইন্দিরা বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা। সবাই তো আর তোমার মত ভোজনা-নন্দ স্বামী নয়, যে, নেমন্তন্নের চিঠি দেখলেই জিভে জল আসবে?'

চিঠিটা আগাগোড়া একবার পড়ল ইন্দিরা, তারপর বলল, 'বাঃ কনের নামটি তো ভারি সুন্দর—শ্রীমতী রুচিরা। কিন্তু এও দেখছি কালীঘাট। ইচ্ছা করলে ফেরার পথে মল্লিকাদির সঙ্গে তো তুমি দেখা করেও আসতে পার। সদানন্দ রোড থেকে মনোহর পুকুর তো আর বেশি দূর নয়।'

বললুম, 'বরং কাছেই। আজই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে। তেমন কিছু জরুরী খবর-টবর তো আর নেই। যাওয়া যাবে আর একদিন সুবিধা মত। কিন্তু অসিতের বিয়েতে কি দেওয়া যায় বল দেখি।'

ইন্দিরা বস্তুবাদিনী, বলল, 'বড়লোকের বিয়েতে মানানসই কিছু কি আর দিতে পারবে। ফুল আর কবিতার বই দাও সেই ভালো। লেখক মানুষ, কোন দোষ থাকবে না। তা ছাড়া তোমার বন্ধুর নির্দেশ তো দেওয়াই আছে।'

অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের বিয়েতে যেসব উপহারের জিনিস বাছাই করে ইন্দিরা, তার মধ্যে বই কি ফুলের নামগন্ধও থাকে না। একবার ভাবলুম

ইন্দিরা নিজে নিমন্ত্রিত হয়নি বলেই বোধহয় আজ সভায় সারতে চাইছে। মনটা খানিকক্ষণ খুঁতখুঁত করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে স্ত্রীর পরামর্শই অবশ্য নিখুঁত বলে মনে হোল। মাসের শেষ। বই আর ফুলই ভালো।

সকাল সকাল অফিস থেকে বেরুলাম। খান তিনেক বই আছে নিজের। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়। কমপ্লিমেণ্টারি কপি যতগুলি প্রাপ্য তার চাইতে আট দশ কপি বেশিই চেয়ে নিয়ে বিলিয়েছি। আরো চাইতে সংকোচ হোল। খান দুই বই নগদ দামে কিনেই নিলাম অন্য দোকান থেকে। সেই সঙ্গে কিনলাম এক খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী আর ফুলের দোকান থেকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। তারপর উঠে বসলাম বাসে।

যদিও বহুকাল যাতায়াত নেই, তবু বাড়ি চিনতে দেরি হোল না। দীপালী উৎসবের মতই আলোয় জ্বলছে অসিতদের সদানন্দ রোডের তেতলা বাড়ি। বহু দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মোটরের সার। সদানন্দ রোডের এ মাথা থেকে ও মাথা গাড়িতে প্রায় ভরে গেছে। একখানা মোটর থেকে জনকয়েক সুদর্শন যুবক আর দুটি চারুদর্শনা মেয়ে নেমে এলেন। বাড়ির ভিতর থেকে কয়েকজন বেরিয়ে উঠে বসলেন আর একখানায়। গাড়িতে উঠবার সময় একটি সপ্তদশীর গাঢ় রক্ত বর্ণ দুটি দুল দুলে উঠল, সমস্ত আলো যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেই দুল দুটির মধ্যে।

'আরে তুমি যে, কখন এলে। যথাস্থানেই দাঁড়িয়েছ দেখছি।' অসিত পিছন থেকে এসে কাঁধে চাপড় দিল, মুখে মুচকি হাসি। সরু পেড়ে কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি, আর সিল্কের পাঞ্জাবীতে চমৎকার মানিয়েছে অসিতকে। বাড়ির ভিতর থেকে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছিলেন, অসিত বলল, 'ইনি আমার বাবা, চিনতে পাচ্ছ? আর আমার বন্ধু কল্যাণ। কলেজে পড়তুম একসঙ্গে। লেখেটেখে আজকাল। অনেকদিন আগে একবার এসেছিল। আপনার বোধ হয় মনে নেই।

অসিতের বাবা মৃদু হাসলেন, 'নিজের ইনটিমেট ক্লাস ফ্রেণ্ডদের নাম আর মুখই আজকাল এক সঙ্গে মনে পড়ে না আর, তো তোমার সহপাঠী—'

অসিতও হাসল, 'কিন্তু বহুকালের পুরোন ক্লায়েন্টদের নাম তো আপনার কোনদিন ভুল হয় না বাবা, চেহারাও বেশ মনে থাকে।'

পরেশবাবু কোন জবাব দিলেন না, মৃদু হেসে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আরো একখানা মোটর এসে দাঁড়াল। পরেশবাবুর এ ব্যস্ততা দেখে বোঝা গেল আগন্তুক বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথি। কিন্তু অবাক লাগল পরেশবাবুর বেশবাসের ধরণ দেখে। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পায়ে সাধারণ চটি। কিছুমাত্র বিদেশীয়ানা নেই। স্বাধীন হয়ে বেশবাসে আচারে আচরণে আমরা তাহলে সত্যিই স্বদেশী হলাম এতদিনে? ভারি খুশি হোল মন। বিলাতফেরৎদের সঙ্গে তাহলে আমাদের সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান এতদিনে ঘুচল।

অসিত সঙ্গে করে আমাকে তাদের বৈঠকখানা গোছের একটা ঘরে নিয়ে বসতে দিয়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো ভাই আসছি ওপর থেকে, আরো বন্ধুরা আছেন ওখানে। একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি।'

ঘরখানা জনবিরল। ঘরের ভিতর দিয়ে লোকজন দলে দলে যাতায়াত করছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ মনে পড়ল বইগুলিতে নাম লিখে আনা হয়নি। এই ফাঁকে লিখে ফেলা যাক।

লিখতে শুরু করেছি এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'এই যে, আপনি বসে বসে কি করছেন এখানে? চলুন, চলুন, ওদিককার প্যাণ্ডেলে চলুন। সবাই গেছেন ওখানে।'

চেয়ে দেখি অসিতদের সেই ক্লার্কটি। প্রায় পরেশবাবুরই মত বয়স। কিন্তু বেশবাসটা মোটেই পরেশবাবুর মত নয়। পরনে মিহি ধুতি পাঞ্জাবী, পায়ে পালিশ করা শু, সোনার বোতাম চিক চিক করছে বুকে।

তিনি বললেন, 'চলুন।'

বিব্রত হয়ে বললুম, 'যাব? কিন্তু এগুলি?'

'ওগুলি কি। ও বই?' ভদ্রলোক হাসলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা। এগুলির না-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

ইতিমধ্যে একদল বন্ধুর সঙ্গে অসিত নেমে এল দোতলা থেকে, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর একটু বসো, এঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এক্ষুনি আসছি।'

বেশী দেরী করল না অসিত। মিনিট কয়েক বাদে আরো পনের বিশ জন বন্ধুকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এসো এবার।'

পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। দোতলার বড় একখানা হল ঘরে ফুলশয্যার আসর বসেছে। ঘর তো নয় গোটা একটা নার্সারী। দক্ষিণের দেয়ালটি চাল-চিত্রের মত সাজানো হয়েছে বিচিত্র ফুলে। তার নিচে চৌদোলায় সালংকারা সুন্দরী বধূ। স্মিতমুখে স্বামীর বন্ধুদের উপহার গ্রহণ করছেন, নমস্কার বিনিময় হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। বাঁদিকে আরো কয়েকটি সুশ্রী তরুণী। বোধ হয় অসিতের বোনেরা, ভাগ্নী, ভাইঝিরা। একটি মেয়ে বউয়ের হাত থেকে উপহারগুলি নিয়ে এক পাশে জড়ো করে রাখছেন আর একজন দাতা আর দানের নাম লিস্ট করছেন, খাতায়। ডানদিকে কিউ করে অসিতের বন্ধুশ্রেণী। আমিও দাঁড়িয়ে গেলুম।

স্ত্রীর সঙ্গে একে একে অসিত বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। সুশীতল সেন ব্যারিস্টার; সমীরণ মুখোপাধ্যায়, এ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট; সুদর্শন দাশগুপ্ত, জজ; আরো বহু, এ্যাডভোকেট, ব্যারিষ্টার, মুনসেফ, উকিল, প্রফেসারদের পরে আমারও পালা এল।

অসিত বলল, 'কল্যাণ সেন। আমার লেখক বন্ধু।'

বইগুলি হাত থেকে নিতে নিতে অসিতের স্ত্রী আমার দিকে তাকালেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'লেখক!'

অন্য কয়েকটি মেয়েও বিস্ময়ে, কৌতূহলে চাইলেন এদিকে।

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

রুচিরা লজ্জিত হয়ে বললেন, 'বিশ্বাস না হবার কি আছে।'

অসিত হেসে আমার দিকে ফিরে তাকাল, 'যাক, এযাত্রা উৎরে গেলে। ঠকে ঠকে আজকালকার পাঠক পাঠিকারা অনেক সেয়ানা হয়ে গেছে। বইয়ের নায়কের রূপ গুণের সঙ্গে তারা লেখককে মিলিয়ে দেখে না।'

অসিতের আর এক বন্ধু মন্তব্য করলেন, 'তাই বলে নিজেদের সঙ্গেও কি মেলাবার জো আছে? মেলাতে হয় রাঁধুনী, চাকর, কুলী, মজুরদের সঙ্গে লেখকেরা আরো সেয়ানা হয়েছেন আজকাল।' তিনি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, বন্ধুদের আর একটি ছোট দল এসে দরজায় দাঁড়াল। পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

অসিত বাইরে এসে বলল, 'তারপর? চয়েস্ কেমন হয়েছে?'

বললুম, 'চয়েস? তবে যে শুনলুম লাভ ম্যারেজ?'

অসিত হেসে বলল, 'নাঃ, কেবল লিখতেই শিখেছ। তাতে বুঝি আর চয়েসের বালাই নেই?'

ভোজের আয়োজন হয়েছে বাড়ির লাগা, একটি খোলা জায়গায়। সামিয়ানা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে ওপরটা। ফ্যান আর ইলেকট্রিক বালবের নীচে অগুনতি চেয়ার। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিস্টার, এডভোকেট, মিঃ মজুমদারের ধনী মারোয়াড়ী মক্কেলদের ভিড়ে প্যাণ্ডেল ভরে গিয়েছে, অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভারও দেখলাম গ্রহণ করেছেন একজন মারোয়াড়ীই। তিনি ভাঙা বাঙলায় সবাইকে আপ্যায়ন জানাচ্ছেন। সিগারেটের কৌটো তুলে ধরছেন প্রত্যেকের কাছে। উর্দি পরা বেয়ারারা ট্রেতে করে ভোজ্য, পানীয় বিতরণ করে যাচ্ছে। ভোজ্য স্পেশাল প্রিপারেশনের আইসক্রীম, পানীয় এক কাপ কফি।

দৈবাৎ আমার দুই পাশে বসেছিলেন জন-দুই ম্যাজিস্ট্রেট আর জজ।

অসিতের বাবা তাঁর কোন একটি কুটুম্বের সঙ্গে তাঁদের যে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তাতেই জানতে পারলুম তাঁদের গভস্থতার কথা। কিন্তু ট্রেতে করে বেয়ারা যখন ভোজ্য পানীয় এগিয়ে নিয়ে এল, তিনজনের দু'জনই স্মিতমুখে ঘাড় নাড়লেন। অসিতের বাবা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, ' মাফ করতে হবে মিস্টার মজুমদার, বড্ড পেটের গোলমালে ভুগছি।'

তৃতীয় জন অনেক অনুরোধে এক কাপ কফি তুলে নিলেন। বেয়ারা বুঝি ভেবেছিল এঁদের সঙ্গে যখন বসেছি আমারও পেটের গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক। তাই আমাকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, অসিতের বাবা দেখতে পেলেন, বেয়ারাকে ডেকে ধমক দিলেন, 'আ: এঁকে দিচ্ছ না কেন? এঁকে দাও, এঁকে দাও', ধমক খেয়ে বেয়ারা ফিরে এসে ট্রে নিয়ে দাঁড়াল।

অসিতের বাবা বললেন, 'নিন, নিন। সংকোচ কিসের অত।'

নিলাম কিন্তু কেমন যেন একটু খিঁচ লাগল। একটু যেন বিরক্তির আভাস আছে মিঃ মজুমদারের গলায়।

শেষে করলুম আইসক্রীম। শেষ করলুম কফি। জজ ম্যাজিস্ট্রেটরা উঠে গেলেন। পাশে এসে বসলেন আর একজন আইন ব্যবসায়ী। নেতৃত্ব কেবল বারেই নয়, রাজনীতিতেও। সভা-সমিতিতে বিশেষ যাই না বলে এতদিন সামনা-সামনি দেখিনি, কিন্তু কাগজে বহুবার ছবি দেখেছি।

মিঃ মজুমদার শশব্যস্তে এগিয়ে এসে বললেন, 'এলেন।'

শ্রীধরবাবু হাসলেন, 'আসব না ভেবে নেমন্তন্ন করেছিলে বুঝি?'

মিঃ মজুমদার হঠাৎ ভেবে পেলেন না কি জবাব দেবেন। এই সময়ে আর একটি বেয়ারা ট্রেতে করে এগিয়ে নিয়ে এল ভোজ্য পানীয়।

শ্রীধরবাবু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

মিঃ মজুমদার বললেন, 'দয়া করে একটা কিছু মুখে আপনাকে দিতেই হবে।'

শ্রীধর বাবু হাসলেন। 'পাগল না ক্ষ্যাপা। আমি কোথাও কিছু মুখে দিই যে এখন দেব? দিতে হয় একটা সিগারেট দাও।'

বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল। এবারো আমার দিকে চোখ পড়ল মিস্টার মজুমদারের। তারপর বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বললেন: 'আঃ ভাই ওঁকে দিচ্ছ না কেন? ওঁকে দাও।'

আমি এবার সজোরে ঘাড় নাড়লুম, 'আমি একবার খেয়েছি।'

মিস্টার মজুমদার বললেন, 'ওঃ, তা নিয়েছেন-নিয়েছেন, একবার নিলে যে আর একবার নেওয়া যাবে না তার কি মানে আছে। আপনাদের বয়সে—' মিস্টার মজুমদার একটু হাসলেন।

এবার আমি উঠে দাঁড়ালুম। এই সময়ে অসিত এসে উপস্থিত হোল প্যাণ্ডেলে। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিতে গেল শ্রীধরবাবুর—তিনি তার হাত ধরে বাধা দিলেন। হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন একটু।

বললুম, 'অসিত, আমি চলি।'

অসিত বলল, 'ওঃ, আমি ভাই আবার আটকে পড়েছিলাম। বোঝই তো। আজ আর কেউ ছাড়তে চাইছে না। কিন্তু চলবে মানে? কিছু খেলে টেলে না।'

বললুম, 'না না, অনেক খেয়েছি। এবার—'

প্যাণ্ডেলের দোর অবধি অসিত আমার পিছনে পিছনে এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে, একবার দেখল। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। অসিত আমার কাঁধে হাত দিয়ে সহানুভূতির স্বরে বলল, 'অনেক যে কি খেয়েছো তা তো জানি। পেটই ভরল না তোমার। কী যে সব সাহেবীয়ানা এদের। দিব্যি লুচিমণ্ডার ব্যবস্থা করবে—তা না পার্টি। এ সব কি আমাদের পোষায়। এ সবে কি আমাদের পেট ভরে? ভারি দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে।' মনে পড়ল কলেজে থাকতে আমাদের আর একজন বন্ধুর বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল অসিতকে। ছাদে কুশাসন পেতে আমরা

সব ভুরিভোজনে বসে গিয়েছিলাম; অসিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল; কিন্তু নিজে একটি সন্দেশের বেশি কিছুতেই নেয়নি, বন্ধু প্রফুল্লকে বলেছিল, 'না ভাই অভ্যাস নেই।'

সেই ভোজসভার দৃশ্য হয়তো অসিতেরও মনে পড়ে থাকবে। আমার জন্য তার দুঃখটা অকৃত্রিম বলেই মনে হোল, তবু ঠিক তৃপ্তি পেলাম না। পেটের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চিন চিন করছিল তা ঠিক। কিন্তু অসিতের কথার পর যেন আর এক ধরণের অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

কফিটা বোধ হয় বেশি কড়া হয়ে থাকবে।

বললুম, 'আচ্ছা এবার চলি অসিত।'

'আঃ অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাঁড়াও। দেখি [illegible] কোন—'

অসিতের সেই ক্লার্কটি এসে উপস্থিত হোল, 'অসিতবাবু।'

'আবার কি।'

'বালীগঞ্জ স্টেশন রোডের দাস সাহেবের বাড়ি মেয়েরা পেট্রোল নেই বলে নিজেদের গাড়িতে আসতে পারেন নি। তাঁরা ট্রামে যেতে চাইছেন।'

'কারা, শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পাগল নাকি! বলুন, আমি নিজে তাঁদের লিফ্‌ট দিয়ে আসছি।'

অসিত আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল, 'দুই সতীন নয়, দুই বোন। তবে প্রায়ই সতীন হব হব করছিল। আর একজায়গায় বিয়ে করে বেঁচেছি, বাঁচিয়েছিও। তবু লিফ্‌ট না দেওয়াটা ভারি অশিষ্টতা হবে, কি বলো? কিন্তু তুমি করবে কি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'আমি তো বাসে যাব।'

অসিত বলল, 'হ্যাঁ, বাসে যাবে না আরো কিছু। বাস ট্রামে আজকাল মানুষ উঠতে পারে? তুমি এক কাজ করো—।' হঠাৎ পকেট থেকে এক টাকার একটা নোট বের করল অসিত, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা রেখে দিয়ে

বলল, 'উঁহু, এক টাকায় হবে না বোধ হয়। রিক্সাওয়ালা ব্যাটারা আজকাল ট্যাক্সীর ভাড়া নেয়। দু' টাকাই রাখ! মোড় থেকে একটা রিক্সা নিয়ে চলে যেয়ো। জ্যোৎস্না রাত আছে। টুং টুং করে ছুটবে। ট্যাক্সীর চেয়ে অনেক বেশি রোম্যান্টিক লাগবে দেখ।'

মুহূর্তকাল নির্বাক হয়ে রইলাম, তারপরে বললাম, 'ওসবের কিছু দরকার নেই অসিত। আমি বাসে বেশ যেতে পারব।'

অসিত বিরক্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঝুলে ঝুলে যেতে যেতে একটা এ্যাক্‌সিডেন্ট ঘটিয়ে বস আর কি। নাও রাখ।'

বলে দু'টাকার নোটখানা আমার ডান দিকের ঝুল পকেটের ভিতরে টুপ করে ফেলে দিয়ে বলল, 'Be worldly my friend, be practical'.

অসিত আর দাঁড়াল না। একটু দূরে দুটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বোধহয় শর্মিষ্ঠা আর দেবযানীই হবেন। অসিত হাসিমুখে তাঁদের দিকে এগিয়ে গেল আমি এগোলাম গেটের দিকে।

একবার ভাবলাম টাকা দুটো কোনো ভিখিরীর হাতে দিয়ে দিই, কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় বিয়ে-বাড়ির ধারে কাছে একটি ভিখারীকেও চোখে পড়ল না। কি হোল পাড়াটার? বিলাত ফেরতের বাড়ী বলে কলকাতার এ অংশটা কি রাতারাতি লণ্ডন হয়ে গেল!

ফুটপাথ ধরে একটু একটু করে এগুতে লাগলাম। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। অসিতের বিয়ের চিঠিতে কি রঙীনই না হয়েছিল সকালটা। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কিছুমাত্র যেন অবশিষ্ট রইল না। হলদে রঙের চিঠি। সে চিঠি যে এখনো পকেটে রয়েছে, কিন্তু তার রঙটুকু গেল কোথায়। হঠাৎ আর একখানা চিঠির কথা মনে পড়ল। মল্লিকার লেখা সেই সাধারণ পোস্টকার্ডখানার কথা। নিতান্ত সাদাসিধে আটপৌরে চিঠি। আমাকে নয়, আমার স্ত্রীকে লেখা। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের কথা নেই, বরং অসুখ বিসুখের কথাই আছে। চিঠিটা আমার পকেটে নেই, কিন্তু তার প্রতিটি লাইন যেন

আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। দু একটি লাইন গুঞ্জরণ করতে লাগল কানে। 'মনেই হয় না এক শহরে আছি। ট্রামে যাচ্ছিলেন খুব কথা বলছিলেন নিজেরা। বাইরের দিকে তাকালেনই না।—ইচ্ছা হয় নিজেই গিয়ে একবার দেখা করে আসি।'—এসব কথা আমাকে লেখেনি মল্লিকা। লিখেছে আমার স্ত্রী ইন্দিরাকে। কি ক'রে সরাসরি লিখবে আমাকে? মল্লিকা নিজেও তো মেয়ে। সে কি আর জানে না এসব বিষয়ে মেয়েদের চোখ কত তীক্ষ্ণ, কত তীব্র তাদের ঘ্রাণশক্তি?

কিন্তু এখনো অত সতর্কভাবে, অত হিসাব করে চলে কেন মল্লিকা? তখনকার কথা কি তার এখনো মনে আছে? আশ্চর্য, আমি কিন্তু একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

এও সেই কলেজী আমলের কাহিনী। পিসতুতো ভাইয়ের শ্বশুর বাড়িতে থেকে বি-এ পড়তুম আর পড়াতুম বউদির ছোট ছোট তিনটি ভাই বোনকে। মল্লিকাও বউদির বোন। তবে তখন আর সে ছোট নয়, বেশ বড়। আমার কাছে বসে তার আর পড়া চলে না। কিন্তু তাই বলে ঠাট্টা তামাসার সম্পর্কে দূর থেকে হোলির দিনে আবীর ছিটাতে তো আর বাধে না। অবশ্য খুব বেশি দূর থেকে নয়, অনেকখানি কাছে এসেই এক মুঠো আবীর আমার চোখেমুখে সেদিন মাখিয়ে দিয়েছিল মল্লিকা। আত্মরক্ষার জন্য আমি তার আবীরসুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরেছিলাম, বলেছিলাম, 'আর একটু হলেই চশমা ভাঙত।'

মল্লিকা বলেছিল, 'বেশ হোত। চশমাটার জন্যই তো রঙটা চোখে লাগল না।'

'চোখ নষ্ট করবার মতলবই ছিল বুঝি?'

'ছিলই তো। হাত ছাড়ুন এবার।'

'মনের অভিসন্ধি জেনেও ছেড়ে দেব? যদি আর না ছাড়ি!'

এবার আবীর ছাড়াও লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছিল মল্লিকার মুখ। মৃদুস্বরে বলেছিল, 'ছাড়ুন, কেউ দেখে ফেলবে।'

তারপর অনেকদিন দেখেছি ভাঁড়ার ঘর থেকে রান্নাঘরে যাতায়াতের পথে মল্লিকা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছে। আঙুলে হলুদের ছোপ। ছাত্রেরা কাছে না থাকলে এদিক ওদিক তাকিয়ে আমিও যে জানলার ধারে দু' একদিন এগিয়ে না গেছি তা নয়, শিকও ধরেছি কিন্তু ভাঙিনি।

তারপর তাহেমশাই মরে যাওয়ার পর আমি অন্য জায়গায় টুইশান নিলাম। মল্লিকাদের জানালাও সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। জীবনে এমন কত জানালা খোলে, কত জানালা নিঃশব্দে বন্ধ হয়, কে তার হিসাব রাখে, কে তার হিসাব রাখতে পারে।

মল্লিকার হিসাবও হারিয়ে ফেলেছিলাম। বছর চার পাঁচ বাদে বিয়ের পর আবার ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হোল। সম্পর্কটা আবিষ্কার করল আমার স্ত্রী। পুরোন সম্পর্ক নয়, নতুন সম্পর্ক। ইন্দিরার এক খুড়তুতো ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে সস্ত্রীক আমিও গেছি, যতীশও গেছে। সেখানেই আলাপ পরিচয় হোল। যতীশ ইন্দিরার জেঠতুতো ভাইয়ের সম্বন্ধী। তারপর দু'একবার আমরাও গেছি, মল্লিকারাও এসেছে, কিন্তু সেই আবীরের প্রসঙ্গ আর কোন দিন ওঠেনি। চশমার পাওয়ার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। কাপড় চোপড়ের দাম বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। আজকাল হোলীর দিনে আবীর আর খেলি না। ঘরের মধ্যে দোর জানালা বন্ধ ক'রে বসে থাকি।

স্মৃতির সেই রুদ্ধদ্বার হঠাৎ আজ এমন ক'রে খুলে গেল কেন ভেবে পেলাম না। কিন্তু একটু একটু করে এগুতে লাগলাম মনোহরপুকুরের দিকে। দেখে আসি কে কেমন আছে। চোখের অসুখে শেষ পর্যন্ত মল্লিকাকেও ধরেছে তাহলে। তখনকার দিনে ভারি নভেল নাটক পড়ত মল্লিকা, আর অবসর পেলেই সেলাইয়ের কাজ নিয়ে পড়ে থাকত। সে অভ্যাস বোধ হয় মল্লিকা এখনো ছাড়তে পারেনি। আর তার ফল ফলতে শুরু হয়েছে।

পুরোন একতলা বাড়ি। সদর দরজা খোলাই ছিল। সবে তো সন্ধ্যা হয়েছে। সাতটা বেজে মিনিট কয়েক। তবু দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বার দুই কড়া নাড়লুম। আরো দু'ঘর ভাড়াটে আছে বাড়িতে। হঠাৎ ঢুকে পড়া ঠিক নয়। একটু বাদেই ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে এল এগিয়ে। আমাকে দেখে উল্লসিত হয়ে ভিতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'মা দেখ এসে কে এসেছে।'

মল্লিকার ছেলেমেয়েদের চেনা শক্ত হল না। মায়ের মুখেরই আদল পেয়েছে ওরা। ঠিক সেই রকম ছোট্ট কপাল, জোড়া ভ্রূ, টানাটানা নাক চোখ। তাছাড়া আগেও তো দু' চারবার ওদের দেখেছি মল্লিকার সঙ্গে। কিন্তু ওদের এই উল্লাসে কেমন যেন একটু লজ্জা বোধ করলাম। 'কে এসেছে' খবরটা ওরা মাকে ডেকে দিতে গেল কেন—বাবাকে ডেকেও তো দিতে পারত।

'বাঃ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন কাকাবাবু আসুন, ভিতরে আসুন।' ছেলেটিই বড়। বছর সাত আট হবে বয়স। এসে হাত ধরল। তার দেখাদেখি মেয়েটি এসে ধরল আর একটা হাত। বছর পাঁচেক হবে বয়স। ফুটফুটে ফর্সা রঙ অবিকল মল্লিকার মত।

সদর দরজা থেকে খানিকটা প্যাসেজের মত গেছে ভিতরের দিকে। দুপাশে চুণবালি ঝরা দেয়াল। মাঝখানে ছোটমত একটু উঠান। উঠানের উত্তরে মল্লিকাদের ঘর। দাওয়ায় রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। শিলনোড়ায় বাটনা বাটছিল মল্লিকা। আমি ঢুকতেই তাড়াতাড়ি আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে বলল, 'আসুন, কি ভাগ্যি। আজই যে আসবেন ভাবতেই পারিনি। চিঠি পেয়েছিলেন বুঝি?'

বললুম, 'পেয়েছিলাম মানে? আমি তো আর পাইনি।'

মল্লিকার আঙুলগুলির দিকে চোখ গেল আমার। হাতে সেই লঙ্কা হলুদের ছোপ। নখের দিকটা একটু ক্ষয়ে গেছে, একটু শীর্ণও হয়েছে যেন আঙুলগুলি, তা সত্ত্বেও ভারি সুন্দর লাগল।

ঘটির জলে হাত ধুতে ধুতে মল্লিকা বলল, 'তারপর একা যে! ইন্দুদি আসেন নি ?'

বললুম, 'না, কেন, একা বুঝি আর আসা যায় না।'

মল্লিকা বলল, 'যাবে না কেন। কিন্তু আসা হয় কই। এপথ তো আজকাল ভুলেই গেছেন।'

বললুম, 'তোমরাই বুঝি খুব মনে রেখেছ। ভালো কথা, যতীশবাবু কোথায়। তাঁকেও তো দেখছিনে।'

মল্লিকা বলল, 'কি করে দেখবেন এখনো তো প্রেসে। রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি আজকাল। বলে কয়ে একটু আগেই বেরোন। না হ'লে তো আর ট্রামবাস পান না।'

মনে পড়ল, দু'তিন ধরণের চাকরি বদলাবার পর কিছুকাল ধরে কম্পোজিটারী করছে যতীশ। ইতিমধ্যে গুটিকয়েক খবরের কাগজ অফিস বদলেছে।

'আসুন ঘরে আসুন। বন্ধু নেই বলে কি ঘরের ভিতরেও ঢুকতে নেই নাকি ?'

দুখানা তক্তপোষে ঘরের বারো আনি জুড়ে গেছে। বিছানা, বালিশ, জড়ো হয়ে রয়েছে চৌকির ওপর। একপাশে অয়েলক্লথে দু'তিন বছরের আর একটি মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কোলের কাছে পুতুল।

উঁচু ক'রে তক্তপোষ পাতা। তার নিচে আর এক সংসার। বাক্স, তোরঙ্গ, হাঁড়িকুড়ি। তক্তপোষের তলা থেকেই ছোট একখানা দড়ির খাটিয়া বের করল মল্লিকা। তাকের ওপর থেকে একখানা আসন নামিয়ে এনে পেতে দিল খাটিয়ায়। বলল, 'বসুন।'

বললাম, 'নিজের হাতে বোনা বুঝি ?'

মল্লিকা একটু হাসল, 'সব দিকেই লক্ষ্য আছে দেখি। তারপর কেমন আছেন বলুন। এদিকে কোথায় এসেছিলেন।'

বললুম, 'কেন, এখানে বুঝি আর আসতে পারিনা।'

মল্লিকা বলল, 'কই আর পারেন। পারলে তো দেখতামই। নিশ্চয়ই কোন কাজকর্ম উপলক্ষ্যে এদিকে এসেছিলেন। সুবিধামত একটু ভদ্রতা রক্ষা ক'রে গেলেন।'

বললুম, 'ঠিক কাজকর্ম নয়, এসেছিলাম এক বড়লোক বন্ধুর বিয়ের প্রীতিভোজে। খেয়েদেয়ে এত আইঢাই করছে পেট যে, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেতে এলাম তোমাদের এখানে।'

'তা তো বটেই। জল ছাড়া আমরা আর কিই বা খাওয়াতে পারি। কি কি খেলেন বিয়ে বাড়িতে?'

যা যা খেয়েছিলাম, বললাম।

মল্লিকা বলল, 'দেখুন তো কাণ্ড। অফিস থেকে বেরিয়ে সরাসরিই তো এসেছেন এদিকে। খুব ক্ষিদে লেগেছে নিশ্চয়ই।'

বললুম, 'আরে না না। বললুম বলেই নাকি।'

মল্লিকা বলল, 'থাক থাক, আর লজ্জার দরকার নাই। আপনি যে খুব লাজুক ভদ্রলোক তা দুনিয়ায় আর জানতে বাকি নেই কারো।'

লাজুক ভদ্রলোক! কোন ইঙ্গিত আছে নাকি কথাটুকুর মধ্যে?

ছেলেকে ডেকে দাওয়ায় নিয়ে গিয়ে আঁচল থেকে পয়সা খুলে দিল মল্লিকা। কি যেন আনতে পাঠাল মোড়ের দোকান থেকে।

বললুম, 'হচ্ছে কি?'

'কিছুই হচ্ছে না, আপনি চুপ করুন দেখি। বরং একটু এদিকে এসে বসুন এগিয়ে।'

তাকের ওপর থেকে কাঁচের ময়দার বৈয়ম আর ঘিয়ের টিন নামিয়ে আনল মল্লিকা। কাঁধ উঁচু একটি কাঁসার থালায় ময়দা মাখতে বসল। ময়দা ডলার সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার চুড়ি আর শাঁখায় ঠুন ঠুন শব্দ হতে লাগল।

বললুম, 'তারপর আছ কেমন।'

মল্লিকা বলল, 'বেশ আছি।'

'চোখের নাকি অসুখ।'

মল্লিকা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'চোখের অসুখ আবার একটা অসুখ নাকি? ওতো আপনারও আছে।'

বললুম, 'আমার আছে বলেই বুঝি তোমারও থাকতে হবে?'

মল্লিকা এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'ইন্দুদি কেমন আছেন আজকাল?'

সংক্ষেপে বললুম, 'ভালোই'।

তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম দেয়ালের দিকে। বুঝতে পারলাম পুরোন প্রসঙ্গ একটুও আর তুলতে দিতে চায় না মল্লিকা। যেতে চায়না কোন রকম কোন ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে। দেওয়ালভরা নতুন পুরোন নানা-রকমের ক্যালেণ্ডার। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্রের ফটো। ফাঁকে ফাঁকে মল্লিকার হাতে বোনা কার্পেট, কাঁচে বাঁধানো সূচিশিল্প। একটি শিল্পকাজ বিশেষ করে চোখে পড়ল, এপাশে ওপাশে নাম না জানা গুটিকয়েক ফুল। মাঝখানে অলঙ্কৃত অক্ষরে দুটি পংক্তি—

'সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন
কাঙালিনী পেলে রাণী এহেন রতন।'

মনে মনে হাসলুম। একথা কি কোন বাঙালী হিন্দুর মেয়েকে কখনো ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে হয়? না কি মনের দেয়াল থেকে বার বার মুছে যেতে চায় বলেই তাকে ঘরের দেয়ালে এমন অক্ষয় ক'রে রাখবার চেষ্টা।

থালায় ক'রে অনেকগুলি লুচি, তরকারি মল্লিকা সামনে এনে রাখল।

বললুম, 'এত কি হবে?'

মল্লিকা বলল, 'এত কই। খানকয়েক মাত্র তো লুচি। রাত্রে বাসায় ফিরে ভালো ভালো জিনিস খেতে পারবেন না, এই তো ভাবনা? বলবেন,

বন্ধুর বাড়ি থেকে পেটভরে পোলাও মাংস খেয়ে এসেছেন, সেইজন্যেই খেতে পারছেন না।'

মল্লিকার ছেলেমেয়ে দুটি, ননী আর ময়না, কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাতে তুলে দিলাম খানকয়েক লুচি। চায়ের প্লেটে ক'রে দুটি মিষ্টি দিয়েছিল মল্লিকা, সে দুটীও ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিলুম।

মল্লিকা বলল, 'বাঃ, সবই বিলিয়ে দিলেন যে।'

বললুম, 'সব বিলিয়ে দিতে আর পারলাম কই। ওরা খেলেই আমার হবে।'

খুব খুশি-খুশি, ভারি উৎফুল্ল দেখাল ননী আর ময়নার মুখ। পান্তুয়ার রস আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেয়ে পড়তে লাগল ময়নার। জল-খাবারের পর চা ক'রে আনল মল্লিকা। নিজেও এক কাপ নিল।

বললুম, 'অনেকদিন পর চা খাচ্ছি মুখো মুখি বসে।'

মল্লিকা বলল, 'আহাহা, বাড়িতে বুঝি একজন আর একজনের দিকে পিছন ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বসে খান?'

চায়ের পর আবার রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড় মল্লিকা। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে তুলে দিল ডালের কড়া।

বললুম, 'এবার উঠি।'

মল্লিকা বলল, 'আসবেন মাঝে মাঝে। পথ যেন একেবারে ভুলেই গেছেন। বউবাজার আর কালীঘাট যেন কেবল গড়ের মাঠের এপার ওপার নয়, সাত সমুদ্র তের নদীর পার।'

ভারি ভালো লাগল কথাটুকু। এতক্ষণ পরে তাহলে সত্যিই অভিমানের সিন্ধু উথলে উঠেছে মল্লিকার!

জবাব না দিয়ে এগুতে লাগলাম সরু প্যাসেজটুকুর ভিতর দিয়ে। দোর পর্যন্ত মল্লিকা এগিয়ে দিল, ফিরে গেল না। দাঁড়িয়েই রইল একখানা কবাটের আড়ালে মুখ বাড়িয়ে।

কিন্তু দু'এক পা এগুতেই দেখি ননী আর ময়না দুদিক থেকে ফের এসে আমার দুখানা হাত চেপে ধরেছে, 'কাকাবাবু, বাঃ দিব্যি পালিয়ে যাচ্ছেন। পয়সা দিলেন না!'

'ওঃ পয়সা।'

ভারি লজ্জিত বোধ করলুম। তাইতো কেবল বড়লোক বন্ধুর ওখানেই লৌকিকতা করেছি—মল্লিকার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কিনে নেওয়াই হয়নি। একবারে শুধু হাতে গিয়ে উঠেছি ওদের ওখানে।

বললুব, 'পয়সাই নেবে। না আম-টাম কিছু কিনে দেব?'

ননী বলল, 'না-না পয়সাই চাই। আপনি ভারি ফাঁকি দিচ্ছিলেন।' বলে ননী নিজেই আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। এক পকেটে খুচরো আনা দুয়েক পয়সা ছিল। ময়না তা তুলে নিল। ননীর হাতে উঠল সেই দু' টাকার নোটখানা। এক মুহূর্ত একটু স্তম্ভিত হয়ে রইল ননী, তারপর হঠাৎ বাড়ির দিকে ছুট দিল।

আমিও মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রইলুম, তারপর ননীকে ডেকে বললুম, 'ছুটছ কেন। পড়ে টড়ে যাবে, আস্তে আস্তে যাও।'

ননী মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কেড়ে নেবেন না তো?

'না-না, কেড়ে নেব না, ভয় নেই।'

কেমন যেন লাগতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটতে সুরু করতে পারলুম না। দেশলাই জেলে সিগারেট ধরালাম।

পরমুহূর্তে ফের ছুটে এল ননী, 'কাকাবাবু টাকা তো আপনি আমাকেই দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই তো দিলাম।'

'তাহলে মা কেড়ে নিলে কেন। আসুন ধমকে দিয়ে যান মাকে।'

হাত ধরে টানতে টানতে ফের দোরের কাছে আমাকে নিয়ে গেল ননী। মল্লিকা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। দু'টাকার নোটখানা তার মুঠির মধ্যে।

হাসতে গেলুম, কিন্তু হাসি যেন ঠিক এলা না, বললুম, 'ব্যাপার কি।'

মল্লিকা বলল, 'আচ্ছা কাণ্ড আপনার। ওদের হাতে অত টাকা দিয়ে গেলেন কেন।'

বললুম, 'তাতে কি হয়েছে।'

মল্লিকা বলল, 'না-না-না, এসব ভালো নয়। এসব কি, এসব দেবেন কেন।

ননী এবার বলল, আচ্ছা কাকাবাবু। এ-টাকা আমাকে দেননি আপনি?

আমি ঘাড় নাড়লুম।

'তবে মা কেন কেড়ে নিচ্ছে?'

মল্লিকা একটু হাসল, কথা শুনে ছেলের। কেড়ে নিয়ে যেন পাড়ার পাঁচজনকে বিলিয়ে দেবে মা। এ যেন তোমাদেরই পেটে যাবে না? রাত পোহালে এক মুড়ি মুড়কিতেই কতগুলি পয়সার দরকার—সে হিসাব আছে?'

বলতে বলতে আঁচলে দু' টাকার নোটখানা বেঁধে রাখল মল্লিকা।

মনে হোল ননীর চোখ দুটি ছলছল করছে। কিন্তু ছেলের দিকে মোটেই তাকাল না মল্লিকা, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'লিখেটিখে খুব বুঝি হচ্ছে আজকাল?'

কিসের এক আনন্দ চকচক করছে মল্লিকার চোখ। ঠোঁটের কোণে সেই আগেকার দিনের হাসি।

বলতে গেলুম, 'না-না'—

মল্লিকা বাধা দিয়ে বলল, আহা, বললে বুঝি সব আমি কেড়ে রাখব, না? ভয় নেই, তা আমি রাখতে পারব না না, তা আপনি দিতেও পারবেন না। কিন্তু দু-এক নাইট সিনেমা দেখাতে তো পারেন? মনে আছে, সেই কতকাল আগে একবার একসঙ্গে—আসবেন একদিন? ওঁর তো আর সময় হয় না।'

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'আসব।

তারপর প্রায় ননীর মত ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম গলি থেকে।